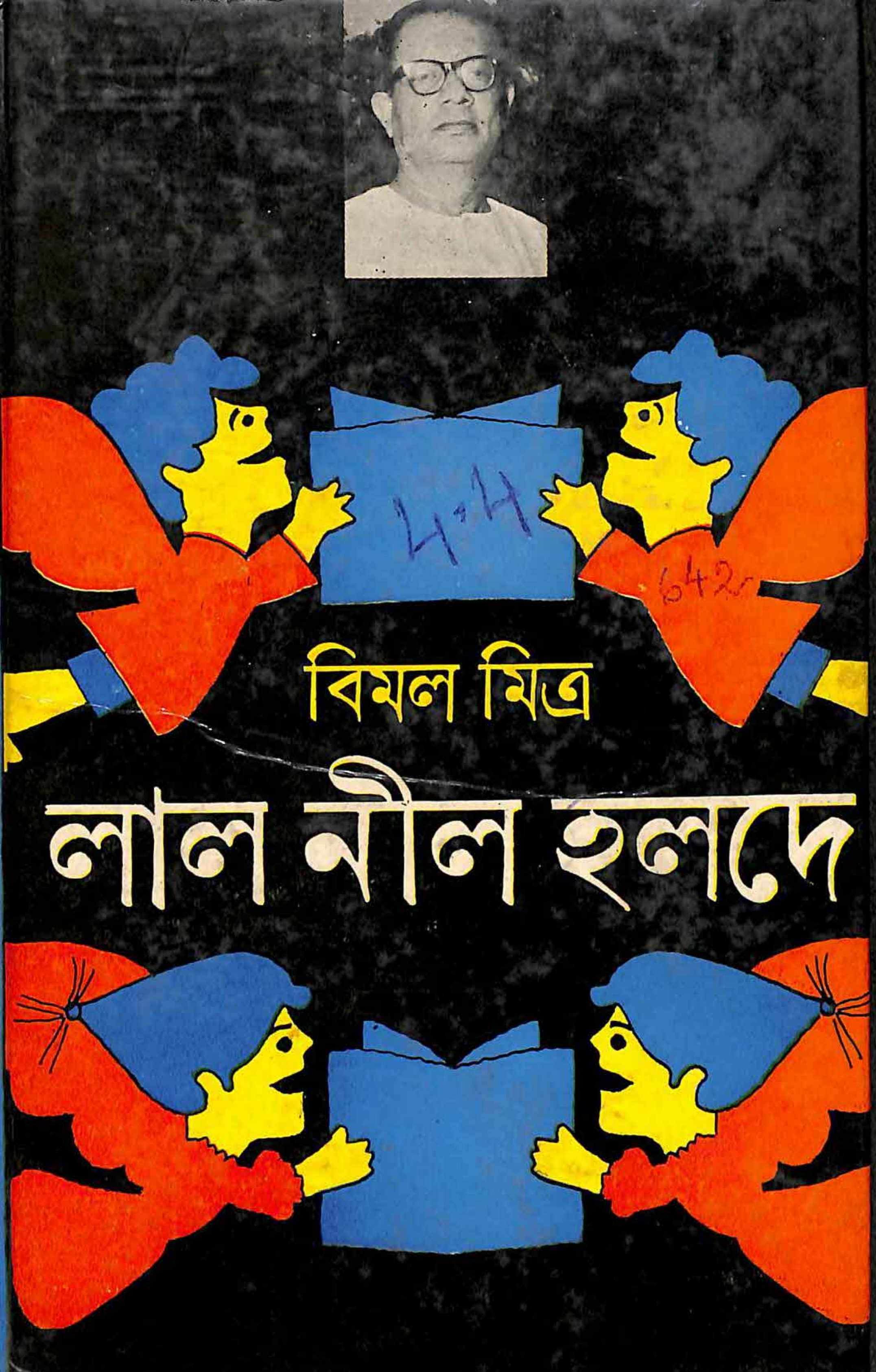

বিমল মিত্র
লাল নীল হলদে

ছোট বড়
সবার জন্য -

বিমল মিত্র

লীলে নীলে হলদে

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

KATHA-CHHILO Rs. 12·50
(The unfulfilled contract)
by Bimal Mitra.

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-700007 (1st floor)

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৯৩
মে, ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
তাপস সাঁতরা
সন্তোষী প্রিন্টার্স
১৪৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ চিত্র :
অমিয় ভট্টাচার্য

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আমাদের প্রকাশিত 'টক-ঝাল-মিষ্টি' গ্রন্থটির অসামান্য সাফল্যে আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গের ও সাধারণের কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের অকৃপণ সহৃদয়তায় উৎসাহিত হয়ে আমরা এবার এই "লাল-নীল-হল্‌দে" গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। জীবনের রঙ কখনও লাল, কখনও নীল আবার কখনও বা হল্‌দে। এই তিনটে রঙই জীবনের আদি রঙ। তিনটি রঙের সমন্বয়ে যে-জীবন-বৈচিত্র্য ঘটে, এই রচনা-সমষ্টি তারই আংশিক প্রতিরূপ। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিমল মিত্রের এই রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের আদর আকর্ষণ করতে পারলে আমাদের প্রকাশনা-সংস্থা অন্যবারের মত এবারেও ধন্যবাদার্হ হবে। বিনীত— প্রকাশক

এই লেখকের আরো কয়েকটি কিশোর গ্রন্থ—

টক-ঝাল-মিষ্টি	১৪৲
কিশোর অমনিবাস	১৪৲
কে ?	১৫৲
দাশরথির বাহাদুরি	১০৲
নবাবী আমল	৮৲

দেখে নাও,

কোন পাতায় কি আছে—

উপন্যাস

আমার বন্ধু শাশ্বত — ৯

বিশাল কাহিনী

লাটসাহেব খুন — ৬৯

ছোটবেলাকার বড় গল্প — ৮৭

সূয্যি-ডুবুরি — ১০৮

বড়ো ভালো লাগে — ১৩৭

বড় গল্প

নীলমণি একটি ভাল্লুক — ৯৯

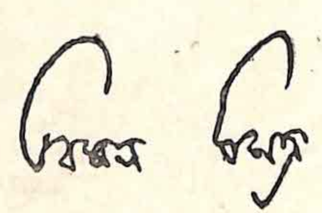
সাক্ষী দাশরথি পাল — ১২৩

ছেলেবেলা — ১৩১

জ্যান্ত ভূতের গল্প — ১৪৭

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার নাম জাল করে প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প-উপন্যাস বাজারে চলছে। ও-নামে অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। আমার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে বহু অসৎ প্রকাশক এই অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাই আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার রচিত গ্রন্থ ক্রয় করবার আগে তাঁরা যেন প্রথম পৃষ্ঠায় আমার মুদ্রিত স্বাক্ষর এবং ভেতরে 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' দেখে তবে গ্রন্থ ক্রয় করেন।



আমার বন্ধু শাশ্বত



আমি শাশ্বতকে ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম। শুধু চিনতামই নয়, তার সঙ্গে আমার রীতিমত মেলামেশা ছিল। শাশ্বত অবশ্য আমাকে বিশেষ পছন্দ করত না। পছন্দ করত না মানে এই নয়, যে সে আমাকে ঘেন্না করত। তার মানে সে আমাকে তার চেয়ে ছোট ভাবত। অথচ আমরা দু'জনেই এক বয়েসের ছিলাম।

সেই শাশ্বতকে এতদিন পরে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শাশ্বতকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কী, তুই? তুই এতদিন পরে?'

শাশ্বত'র চেহারা দেখে আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছি। কোথায় গেল তার সেই রূপের জৌলুশ. কোথায় গেল তার তারুণ্যের সারল্য! তারুণ্য আর সারল্য যখন কোনও মানুষের চেহারায় একাকার হয়ে যায়, তখন লোকে তাকে ভালবাসে। তখন লোকে বলে—হ্যাঁ, এই-ই আমার মনের মানুষ, এরই জন্যে আমি এতদিন অপেক্ষা করে বসে ছিলাম। কিন্তু শাশ্বত যে এ-রকম হয়ে যাবে, তা কি আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম?

সত্যিই শাশ্বতকে চিনতে আমার একটু কষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমে আমি তাকে চিনতেই পারেনি। এমন কালো গাল-তোবড়া মানুষটা যে আমাদের সেই প্রথম জীবনের শাশ্বত, তা আমি কী করেই বা কল্পনা করতে পারব?

বললাম, 'বোস্, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

আশ্চর্য, যে-শাশ্বত আমাদের এককালে এত তাচ্ছিল্য করত, আমাদের এত নীচু নজরে দেখত. আজ সেই শাশ্বতই কিনা যেচে আমার অফিসে এসেছে। সামনের চেয়ারে বসতে যেন তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সত্যিই তো, ওই ছেঁড়া জামা, ওই ময়লা প্যান্ট পরে আমার এই সাজানো অফিস-ঘরে সে বসবেই বা কী করে ?

শাশ্বত বললে, 'তোমার অফিসের দারোয়ান আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না ভাই। বলে কিনা, সাহেবের ঘরে ঢুকতে হলে শ্লিপ চাই। তাই শ্লিপ লিখে দেবার পর তোমার ঘরে ঢোকবার অনুমতি পেলাম।'

বললাম, 'ভাই, লোকে বড্ড বিরক্ত করে বলে এই নিয়ম করেছি। এখানে আমার কাছে যারাই আসে, সবাই কিছু-না-কিছু চায়।'

শাশ্বত বললে, 'আমিও তো তাই তোমার কাছে এসেছি! তুমি আমার একটা উপকার করে দাও ভাই।'

বললাম, 'তার আগে তুই বল কী খাবি।'

'আমি? খাব? কী খাওয়াবে তুমি বলো! তুমি যা খাওয়াবে আমি তাই খাব। আমি অনেকদিন পেট ভরে খেতে পাইনি।'

বলে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে শাশ্বত! আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার চাইবার ভঙ্গি দেখে! এমন কথা তো তার মুখ থেকে আগে কখনও শুনিনি। শাশ্বত'র সঙ্গে একদিন এক স্কুলে, একই ক্লাশে আমরা পড়েছি। বরাবর শাশ্বত আমাদের চোখে বড় ছিল। বয়সে নয়, অন্য সব ব্যাপারে। লেখাপড়ায় যে-সে ভাল ছিল, তা নয়। কোনও রকমে সে পাস করতো এই পর্যন্ত! শাশ্বত সম্বন্ধে মাষ্টারমশাইদেরও খুব ভাল ধারণা ছিল না। সবাই-ই বলত, শাশ্বত যদি মন দিয়ে পড়া-শোনা করে, তো সে ফাস্ট´ হবেই—হবে।

সত্যিই শাশ্বত পড়ার সময় পেত না। আমরা যখন বাড়িতে বসে লেখাপড়ায় মন দিতাম, তখন সে কলকাতার ময়দানে খেলতে যেত।

শাশ্বত ছিল বলতে গেলে আমার প্রাণের বন্ধু। তাই বন্ধু-বান্ধবেরা আমাদের দু'জনকে বলতো 'মাণিক-জোড়'। শাশ্বত'র সব কিছুই আমার ভাল লাগত। তার চেহারা, সাজ-পোশাক, তার কথাবার্তা, তার চালচলন সমস্তই আমি অনুকরণ করতে চেষ্টা করতাম।

শাশ্বত বলত, 'তোর নাম ভোঁদা। তাই তোকে দেখতেও ভোঁদার মতো।'

আমার বাবা যে আমার 'ভোঁদা' নাম কেন রেখেছিলেন, কে জানে!

আমি বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম, 'আমার ভোঁদা নাম কেন রেখেছিলে তোমরা?'

মা বলতেন, 'ওটা তো তোর ডাক-নাম! তোর আসল নামটা তো ভাল। মানুষের কি নাম দিয়ে পরিচয় হয়? মানুষের আসল পরিচয় তো হয় তার কাজ দিয়ে। তুই যখন বড় হবি, তখন ওই ভোঁদা নামটা সবাই ভুলে যাবে।'

ওই নামটার জন্যে ছেলেবেলায় বরাবরই আমার দুঃখ ছিল খুব। আমি বরাবরই একটু অল্পতেই কাতর হয়ে যেতাম। কেউ আমাকে তাচ্ছিল্য করলে আমি বুকে আঘাত পেতাম। একটু কড়া কথা বললেই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। আমার এই স্বভাবের জন্যে আমি বাড়িতে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতুম। সে-সব কথা বাইরের কেউই জানতে পারত না। আবার যখন ঘরের বাইরে আসতুম, তখন চোখ-মুখ মুছে ফেলতাম ভাল করে। যাতে আমার দুর্বলতা কেউ না জানতে পারে। আমি কিছু বললেই শাশ্বত বলতো, 'তুই বড্ড ভোঁদার মতো কথা বলিস।'

আমি বলতাম, 'বাবা ভোঁদা নাম রেখেছিল, তা আমি কী করবো?'

শাশ্বত বলত, 'নাম যাই হোক, তা-বলে ভোঁদার মতো কথা বলবি কেন? ভোঁদার মতন কথা বলতেও কি তোর বাবা শিখিয়ে দিয়েছে?'

শাশ্বত'র কথা শুনে আমার কান্না আসত। কেবল মনে হতো আমি কেমন করে সকলের প্রিয় হতে পারব! কী করলে সবাই আমাকে ভালবাসবে। শুধু কি বাইরের লোক? বাড়ির ভেতরে বাবা-মা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউই আমাকে দেখতে পারত না। সবাই ভাবত, আমি নামেও ভোঁদা, কাজেও ভোঁদা।

বড়লোক বলতে যা বোঝায়, আমরা সমাজে তখন তাই-ই ছিলাম।

আমার বাবার অনেক টাকা ছিল। অন্ততঃ আমার তাই-ই মনে হতো। আমাদের বাড়িতে গাড়ি ছিল। বাবা সেই গাড়িতে চড়ে অফিসে যেতেন। বাবা অফিস থেকে ফিরে এলে সে-গাড়িতে মা-ভাই-বোন চড়ত। চড়ে নিউমার্কেটে যেত। কখনও-কখনও সিনেমা দেখতে যেত। বড়দিনের সময়ে বাজার থেকে কেক-বিস্কুট কিনে আনত। অনেক সময় আমাকেও দিত যেসব জিনিস। কিন্তু আমি বেশির ভাগ দিনই সে-সব খেতাম না।

মা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেনরে, খাবি না কেন?'

আমি বলতাম, 'আমার খেতে ভাল লাগে না।'

'সে-কী রে, কেক খেতে তোর ভাল লাগে না?'

বাবা শুনতে পেলে বলতেন, 'ও যখন খেতে চাইছে না, তখন ওকে খাবার জন্যে অত সাধছ কেন?'

আসলে সত্যি কথা বলতে কী, আমার খেতে, গাড়ি চড়তে, সিনেমা দেখতে খুবই ভাল লাগত। কিন্তু আমার যে মনের মধ্যে কী হতো তা কেউ বুঝতে পারত না, বুঝতে চাইতও না। আমার কেবল মনে হতো আমাকে সবাই অবহেলা করে, আমাকে সবাই তাচ্ছিল্য করে, সবাই থাকতেও মনে হতো পৃথিবীতে কেউ নেই যেন আমার, মনে হতো আমি একলা।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একলা-একলা আপন মনে রাস্তা দিয়ে চলেছি। তখন রাস্তাটা নিরিবিলি। লোকজন কিছু নেই।

একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। ডাকলে, 'খোকা।'

ডাক শুনেই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকারে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো সে আমার অচেনা।

বললাম, 'কী?... কিছু বলবে আমাকে?'

লোকটা বললে, 'তুমি পাখি নেবে? চন্দনা পাখি?'

আমিও অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এত লোক থাকতে লোকটা আমাকে পাখি দিতে চাইছে কেন? বললাম, 'দাও।'

লোকটা বললে 'আমি পাখিটাকে সিঙ্গাপুর থেকে ধরেছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা পাখিটা আমাকে দেবে কেন? আর কেউ নেই তোমার?'

লোকটা বললে, 'আমার নিজের যদি কেউ থাকত, তো তাকেই তো দিতুম! আমার কেউ নেই বলেই তো তোমাকে দিতে চাইছি।'

'তোমার কেউ নেই?'

লোকটা বললে, 'না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'আমি কাল রাত্তিরে একটি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি যে মা-কালী আমাকে বলছে যে, রাস্তায় বেরিয়ে যে-ছেলেটাকে তুই প্রথম দেখবি, তাকেই এই পাখিটা দিয়ে দিবি, তা'হলে তোর ভাল হবে। তা আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমাকেই প্রথম দেখলুম, তাই তোমাকেই পাখিটা দিতে চাই। তুমি নেবে? তুমি পাখিটাকে নিলে আমি বাঁচি, আমার খুব ভাল হবে।'

আমি বললাম, 'পাখিটা নিয়ে আমি কী করব?'

'তুমি বাড়িতে তাকে পুষবে। সে খুব কথা বলতে পারে। সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি কি না।'

আমার খুব আনন্দ হলো। আমাকে তো কেউ ভালবাসে না। আমার নিজের বলতে তো কিছু নেই। অন্তত আমার একটা নিজস্ব জিনিস হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'পাখিটা কী কথা বলে ?'

লোকটা বললে, 'তুমি যা বলতে শেখাবে, সেইকথাই বলবে।'

বললাম, 'তা'হলে দাও পাখিটা।'

লোকটা বললে, 'তা'হলে আমার বাড়িতে চলো।'

'তোমার বাড়ি কত দূরে ?'

লোকটা বললে, 'এই কাছেই। তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো, আমি তোমাকে খাঁচাসুদ্ধ পাখিটা দিয়ে দেব।'

লোকটাকে আমার খুব বিশ্বাস হলো। আমি তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলাম। লোকটা আগে-আগে চলছে আর আমিও তার সঙ্গে চলেছি। কিন্তু লোকটা চলছে তো চলছেই। অথচ বললে খুব কাছেই তার বাড়ি। রাস্তা ছেড়ে সে প্রথমে বাজারের পথ ধরলে। ভাবলাম, বাজারটার পেছনই তার বাড়ি। সত্যিই লোকটা বাজারের পেছন দিকে ঢুকল। সে-দিকটায় বিরাট একটা বস্তি। বস্তির ভেতরে অনেক গরীব লোক থাকে। সাধারণত ওদিকে আমরা কেউই বড় একটা যাই না। জল-কাদায় চারদিক প্যাচ্-প্যাচ্ করছে। মধ্যিখান দিয়ে লম্বা করে ইট পাতা রাস্তা।

লোকটা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি ভয় পাচ্ছে খোকা ?'

আমার সত্যিই ভয় করছিল। কিন্তু মুখে বললাম, 'না।'

লোকটা বললে, 'না, ভয় পাবার কি আছে ? আমি তো সঙ্গে আছি। কেউ যদি কিছু করতে আসে তো, আমি তাকে খুন করে ফেলব। আমার গায়ে খুব জোর আছে। আমি ছাতু-খাওয়া মানুষ, আমি একসঙ্গে দশজন গুণ্ডার সঙ্গে লড়তে পারি—'

বলে লোকটা আবার যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল।

আমার একবার মনে হল আমি কেন লোকটার সঙ্গে এখানে আসতে গেলুম ? সামান্য একটা পাখির লোভে ? পাখি নিয়ে আমি কী করব ? ছেলেবেলা থেকে আমার খুব পায়রা পোষবার শখ। কুকুর পোষবার শখ। মানুষের কাছে ভালবাসা পাইনি বলে আমার মনটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ারের দিকে ঝুঁকেছিল। ভাবতুম, একটা কুকুর থাকলে সে আমাকে ভালবাসত, আর আমিও প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবাসতুম। আর পায়রা থাকলে বেশ আকাশে উড়তো। আকাশে ঘুরে-ঘুরে মেঘেদের সঙ্গে গিয়ে মিশত। আমার মনও ওই রকম উড়ে বেড়াতে চাইত। এই কুটিল পৃথিবীর থেকে ছাড়া পেয়ে

খোলা আকাশে বেড়াতে যে কত আনন্দ, তা পায়রাদের ওড়া দেখে বুঝতে পারতুম। একটু বোঝবার তখন বয়েস হয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষরা সবাই দুষ্টু। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। কারও কিছু ভালো হলে সকলের হিংসে হয়। এমন কী, বাড়ীর বাবা-মায়ের কাছ থেকেও আমি সেই-রকমের ব্যবহার পেয়ে এসেছি।

কিন্তু তখন তো আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না যে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই! পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? কে আমায় আশ্রয় দেবে?

হঠাৎ লোকটা পেছন ফিরে দেখল আমি তার সঙ্গে আসছি কিনা। জিজ্ঞেস করলে, "আমার সঙ্গে আসছ তো খোকা?"

'হ্যাঁ, আসছি।'

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, মনে হচ্ছিল লোকটার সঙ্গে না এলেই ভাল হত। কিন্তু তখন অনেক দূরে চলে এসেছি, আর ফেরবারও সুযোগ ছিল না।

লোকটা এবার একটা জায়গায় গিয়ে থামল।

থেমে বললে, 'এই বাড়ি, এসো আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে এসো।'

বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। একটা ভাঙা ভূতের বাড়ি বলে মনে হল। বহুকাল আগে ও-বাড়িটার ভেতরে অনেক লোকজন ছিল। গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল ওর ভেতরে। ও-বাড়িতে যারা বাস করত, তারা কবে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানত না। শুধু এইটুকু জানত যে, শরিকে-শরিকে মামলা হয়ে সবাই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে সে মামলা চলেছিল। উকিল-মুহুরী-পেশকার-অ্যাটর্নি সবাই মিলে কেবল টাকা খেয়েছে। তারপর যখন আর টাকা ছিল না, তখন মামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মক্কেলরা যখন মামলা করে-করে শুকনো ছিপড়েয় পরিণত হয়েছে, তখন উকিল-মোক্তারদের নিজেদের বাড়ি হয়েছে। তারা সবাই মক্কেলের টাকায় একখানা-দু'খানা করে বাড়ি করে ফেলেছে। শেষকালে যখন পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুর স্রোতের ঢেউ এসে এদেশে আছড়ে পড়েছে, তখন তারা ওরই কোটরে কোনওরকমে মাথা গোঁজবার জায়গা করে নিয়েছে। এসব আমরা জানতাম ওখানে প্রায়ই বোমাবাজি হয়। কেন বোমাবাজি হয়, কাদের ওপর সে-বোমাবাজি হয়, কাদের ওপর সে-বোমা পড়ে, তা জানতাম না। কিন্তু জায়গাটা যে খারাপ, তা আমাদের পাড়ার সবাই জানতাম। কিন্তু লোকটা যে সেই বাড়িতে থাকে, তা আগে জানলে আমি আসতাম না।

লোকটা বললে, 'কই, ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, আমার সঙ্গে এসো। কোনও ভয় নেই তোমার, আমি তো আছি—'

আমি তখন দ্বিধা করছি দেখে লোকটা বললে, 'এসো-এসো, চলে এসো—'

আমি যাব কি না ভাবছি এমন সময় শুনি পেছন থেকে একটা গলার আওয়াজ এল, 'এই ভোঁদা, তুই এখানে কী করতে?'

শুনেই বুঝলাম, এ শাশ্বতের গলা। আমি পেছন ফিরে দেখি, সত্যিই শাশ্বত!

এমন জায়গায় এমন সময়ে শাশ্বতকে এখানে দেখতে পাব ভাবতে পারিনি! বুকে তখন একটা বল পেলাম। ততক্ষণে শাশ্বত আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে, তুই? তুই এখানে কী করতে এসেছিস? এ-পাড়ায় তোর কী কাজ?'

আমি বললুম, 'ওই লোকটা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।'

লোকটার দিকে শাশ্বত চেয়ে দেখলে। জিজ্ঞেস করলে, 'কে ও?'

বললাম, 'তা জানি না। ও আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এল।'

'কেন ডেকে নিয়ে এল?'

'বললে, আমাকে একটা সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি দেবে।'

'সিঙ্গাপুরী-চন্দনা পাখি? চন্দনা পাখি নিয়ে তুই কী করবি?'

বললাম, 'পুষব।'

'তা এত লোক থাকতে তোকে কেন পাখি দেবে? পাখি দেবার আর কোনও লোক পেলে না?'—বলে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা কোথা দিয়ে কোন্ দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শাশ্বত লোকটার পেছন-পেছন খানিকটা দৌড়ে গেল, কিন্তু তার আগেই লোকটা পালিয়ে গিয়েছে। শেষে শাশ্বত হতাশ হয়ে আবার ফিরে এল। এসে বললে, 'তুই কী-রে, একটা জোচ্চরের কথায় বিশ্বাস করে তুই এখানে এসেছিলি? এখন আমি যদি না এসে পড়তুম, তা'হলে কী হতো বল্ দিকিনি?'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হতো?'

'কী হতো জানিস না?'

আমি বললাম, 'কী আর হতো। আমার পকেটে তো কোনও পয়সা ছিল না, যে তাই কেড়ে নেবে!'

শাশ্বত বললে, 'টাকা-পয়সা না-ই বা থাকল, কিন্তু তোকে যে খুন করে ফেলতো রে! তা-তুই জানিস না?'

বললাম, 'আমাকে খুন করে ওর কী লাভ?'

শাশ্বত বললে, 'তোকে খুন করলে ওর কম হাজার টাকা উপায় হত।'

আমাকে খুন করে যে লোকটার কী করে হাজার টাকা উপায়

হতো, তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শাশ্বত বললে, 'তুই একটা আস্ত গাধা। তোর নামও যেমন ভোঁদা, তোর বুদ্ধিটিও তেমনি ভোঁদার মতন। জানিস্ না মানুষের হাড়ের কত দাম আজকাল।']

আমি বললাম, 'মানুষের হাড় দিয়ে কী হয়?'

'কী হয় জানিস না? আজকাল তো পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হাড় আসছে না, তাই পৃথিবীর বাজারে হাড়ের দাম খুব বেড়ে গেছে। ডাক্তারি পড়তে গেলে তো মানুষের হাড় দরকার হয়। তা-সে হাড় আসবে কোত্থেকে? আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানিতে মানুষের হাড় কোথায় পাবে লোকেরা? আর আমাদের দেশের তো মানুষ মরে গেলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়। তাই হাড়ের বাজার-দর খুব চড়া। যারা হাড়ের কারবার করে, তারা এক-একটা মানুষের পুরো হাড়ের জন্যে অনেক দর দেয়। সেই হাড় লুকিয়ে-লুকিয়ে বিদেশে চালান দেয় তারা। চালান দিয়ে তারা কোটি-কোটি টাকা উপায় করে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ও লোকটা সে-রকম নয়, আমাকে পাখি দেবে বলেছিল।'

'পাখি দেবে না ছাই দেবে। ওই বলে তোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের আড্ডায় নিয়ে আসছিল। দেখেছে বোকা-হাঁদা ছেলে, তাই তোকে পাখি দেবার নাম করেছিল। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলুম, তাই তুই খুব জোর বেঁচে গেলি।'

আমি শাশ্বত'র কথাগুলো শুনে তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছি। কেন আমার অত পাখি পোষবার শখ হয়েছিল। কেন অচেনা লোকের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। শাশ্বত বললে 'চল, এখন বাড়ি চল, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছিস এই-ই যথেষ্ট, চল—'

সত্যিই ভগবানের দয়াই বটে। লোকটা যদি দাগী গুণ্ডা না হবে, তা'হলে শাশ্বতকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েই বা গেল কেন? ও তো সোজা কথাটা বলতেই পারত। পালিয়ে যাবার কী ছিল। আর সত্যিই যদি আমায় কেটে ফেলতো, তা হলে কী হত? আমার খুব লাগতো তখন, আমি চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেই পারতুম না।

শাশ্বত বললে, 'আর কক্ষনো অচেনা লোকের কথায় কোথাও যাসনি, এই তোকে বলে রাখলুম। আজকাল কলকাতা শহরটা গুণ্ডাতে একেবারে

ভরে গেছে। এত যে খুন-খারাপি হচ্ছে, সে তো এই জন্যেই।'

আমি বললাম, 'খবরের কাগজে খুন-খারাপির খবর তাই এত লেখা হয়? আসল ব্যাপারটা আমি জানতাম না।'

শাশ্বত বললে, 'আরে খবরের কাগজে আসল খবর আর ক'টা বেরোয়। অর্ধেকেরও কম। যে খবরগুলো বেরোয় যা বা যে-খবরগুলো কেউ জানতে পারে না, সেই খুনগুলোই তো বেশি। দেখছিস্ না, কত বোমাবাজি বেড়ে গেছে কলকাতায়।'

বললাম, 'কেন বেড়ে গেছে রে?'

শাশ্বত বললে, 'ওই তো বললুম হাড়ের দাম বেড়েছে বলে। হাড় দিয়ে তো চাষ-বাষের সার তৈরি হয়। সে হাড় কোথায় পাবে? আগে পাড়াগাঁয়ের ঘাটে-মাটে মরা গরুর হাড় ছড়িয়ে থাকতো, কিন্তু এখন একটাও খুঁজে পাবি না, সব হাড়ের দালালরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়—'

কথা বলতে-বলতে তখন দু'জনে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ আমি বললুম, 'ভাগ্যিস তুই ছিলি শাশ্বত, তাই খুব জোর বেঁচে গেলুম।'

শাশ্বত বললো 'আমি তো সবচেয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই রে।'

বললাম, 'তোর ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন? আমার কাছে তো সবসময় পিস্তল থাকে। আমি খালি হাতে কখনও রাস্তায় বেরোই না। হয় পিস্তল, নয় ভোজালি, নয় গুপ্তি আমার কাছে থাকেই—'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গুপ্তি কী?'

'গুপ্তি এক রকমের ছড়ি বা লাঠি। সেটা বাইরে থেকে লাঠির মতন দেখতে, কিন্তু সেই লাঠির মধ্যে লুকোন থাকে সড়কি।'

'সড়কি কী?'

'সে এক রকম সোর্ড। সরু লম্বা ছোরার মতন। মাথায় ধারালো ফলা। সেই সড়কি দিয়ে যদি কারও পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, তো সে ছটপট করে সঙ্গে-সঙ্গে মারা যাবে। অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, আমার হাতে বুঝি একটা লাঠি রয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে শাশ্বতকে দেখতে লাগলাম। তাকে দেখে খুব গর্ব হতে লাগল। ভাগ্যিস শাশ্বত'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে তো আমি খুন হয়ে যেতাম। শাশ্বত বললে, 'তুই খুব জোর বেঁচে গিয়েছিস্।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাকে লোকটা যে বললে সে মা-কালীর কাছ থেকে নাকি স্বপ্ন পেয়েছে যে, সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে যাকে সে প্রথম দেখবে,

তাকেই সে পাখিটা দেবে।'

শাশ্বত বললে, 'ওই বলেই তো ছেলেদের ধাপ্পা দেয় ওরা।'

শাশ্বত জানত, আমার মতো ছেলেকে ধাপ্পা দিয়ে ঠকানো খুব সোজা। তাই শাশ্বত আমাকে বোঝাতে লাগল—'অচেনা লোকের কোনও কথায় তুই বিশ্বাস করবি না। আমার মামা আমাকে বলে দিয়েছে, আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

বললাম, 'তুই যে সঙ্গে পিস্তল রাখিস তোকে যদি পুলিশ ধরে?'

শাশ্বত বললে, 'আমাকে পুলিশ ধরবে না।'

'কেন?'

শাশ্বত বললে, 'আমার মামা তো পুলিশ কমিশনার।'

আমি আরও অবাক। শাশ্বত'র মামা পুলিস কমিশনার?

'তোর নিজের মামা?'

শাশ্বত বললে, 'হ্যাঁ, আমার মায়ের নিজের আপন ভাই।'

'কিন্তু তুই তো এ-কথা আগে বলিসনি কখনও?'

'এই তোকেই প্রথম কথাটা বললুম। এর আগে কাউকে বলিনি। তুই যেন কাউকে বলে দিস্‌নি, বুঝলি? মামা বলতে বারণ করে দিয়েছে।'

'কেন, বললে কী দোষ?'

শাশ্বত বললে, 'না ভাই, মামা বলেছে এ-কথা জানলে সবাই মামাকে গিয়ে বিরক্ত করবে। সবাই মামার কাছে গিয়ে চাকরি চাইবে।'

'তাহ'লে তোর চাকরি তো বাঁধা। বড় হলে তোর মামা তো তোকে বড় চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে।'

শাশ্বত বললে, 'তা-তো দেবেই। মামা বলেছে আমার চাকরির জন্যে আমাকে ভাবতে হবে না। তাই জন্যেই এখন থেকে রিভলভার নিয়ে বেড়াই।'

আমি বললাম, 'রিভলভার নিয়ে বেড়ালে পুলিসে ধরে না?'

'পুলিস!' পুলিসের নাম শুনে শাশ্বত হো-হো করে হেসে উঠল। পুলিস যেন শাশ্বত'র কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জিনিস! তখন পুলিসকে দেখলে ভয়ে গা শিরশির করত। আর সেই পুলিসকেই শাশ্বত কিনা মানতে চায় না?

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই রিভলভার পেলি কী করে'?

শাশ্বত বললে, 'আমার মামা যে দিয়েছে। আমার মামার তো অনেকগুলো রিভলভার। একদিন আমি একটা রিভলভার চেয়েছিলুম, তাই আমাকে একটা দিয়ে দিলে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তুই একটা পিস্তল নিবি?'

বললাম, 'আমি তো পিস্তল চালাতে শিখিনি, আমি পিস্তল কখনও হাত দিয়ে ছুঁইওনি।'

শাশ্বত বললে, 'তুই একটু আড়ালে চল, তোকে পিস্তল দেখাব।'

বলে আমাকে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে ট্যাঁক থেকে পিস্তলটা আমাকে দেখালে। আমি দেখলাম। অন্ধকারে যতটা দেখা যায়, ততটাই দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এর ভেতরে গুলি ভরা আছে?'

শাশ্বত বললে, 'হ্যাঁ, তিনটে গুলি ভরা আছে।'

আনন্দে, বিস্ময়ে, বন্ধু-গর্বে আমার বুকটা দশ হাত ফুলে উঠল। মনে হলো, এত লোক থাকতে শাশ্বতই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কী করে জানলি যে লোকটা গুণ্ডা?'

শাশ্বত বললে, 'আমি পাড়ার গুণ্ডাদের সবাইকে চিনি।'

'কী করে চিনলি?'

শাশ্বত বললে, 'তুই কাউকে বলবি না, বল আগে!'

আমি বললাম, 'কথা দিচ্ছি কাউকে বলব না।'

শাশ্বত গলাটা নীচু করলে।

তারপর বললে, 'আমি রোজ রাত্তিরে গুণ্ডা ধরতে বেরোই।'

আমি বুঝতে পারলুম না। বললাম, 'গুণ্ডা ধরতে মানে?'

শাশ্বত বললে, 'তোরা যখন ঘুমোস্ তখন আমার কাজ শুরু হয়। আমি খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে যাই না। আমি আমার এই রিভলভারটা আর সড়কিটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।'

'তোর ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন? আমার মামা তো পুলিসের কমিশনার রে! আমি যত গুণ্ডা ধরি, সবাইকে মামার হাতে তুলে দিই। মামা তাদের ধরে জেলে পোরে।'

'কী করে গুণ্ডাদের ধরিস?'

'এই পিস্তল দেখিয়ে।'

'কিন্তু যদি অনেকগুলো গুণ্ডা একসঙ্গে মিলে তোকে ধরে, তখন? তুই একলা সকলের সঙ্গে লড়তে পারবি?'

'কেন পারব না। আমি তো যুযুৎসু জানি। যুযুৎসুর প্যাঁচ মেরে সবাইকে চিৎ করে ফেলে দিই। তখন গুলি করে সবগুলোকে মেরে ফেলি!'

শাশ্বত'র কথা শুনে আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম, আর তার বীরত্বের কথা

শুনে নিজের বন্ধু বলে শাশ্বতকে নিয়ে আমার গর্বও হত। ভাবতাম, আমাকে বিশ্বাস করে শাশ্বত সব কথা বলে. আর কাউকেই আমার মতো বিশ্বাস করে না, এও তো আমার কাছে গৌরবের জিনিস।

ক্লাসে যখন শাশ্বত লেখা-পড়া পারতো না বলে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেত, তখন আমার খুব কষ্ট হ'ত। মাস্টারমশাইরা তো জানেন না যে, শাশ্বত কত বড় বীর! শাশ্বত'র নিজের মামা যে পুলিসের একেবারে খোদ বড়কর্তা, পুলিস কমিশনার, তাও জানেন না। তাই শাশ্বত'র জন্যে আমার দুঃখ না হলেও দুঃখ হ'ত মাস্টার-মশাইদের জন্যে। সত্যি, মাস্টারমশাইরা কী বোকা। তাঁরা জানেন না যে, শাশ্বত ইচ্ছে করলে তাঁদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারে। তখন?

কিন্তু শাশ্বত'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তার গুণ্ডা ধরার কাহিনী, তার মামার কাহিনী কাউকেই বলব না। আমি তাই কাউকেই কোনদিন কিছু বলিনি।

গরমের ছুটির সময় শাশ্বত দুপুরবেলায় আমাদের বাড়িতে আসত। আমার বাড়িতে আমার মা আমাকে শাশ্বত'র সঙ্গে মিশতে দিত না।

মা বলত, 'ওর সঙ্গে মিশিস কেন তুই? ও ছেলেটা খুব দুষ্টু।'

দাদারাও পছন্দ করত না যে, আমি শাশ্বত'র সঙ্গে মিশি। সবাই জানত শাশ্বত লেখাপড়ায় ভাল নয়। খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশে আমিও পাছে খারাপ হয়ে যাই, এই-ই ছিল সকলের ভয়। কিন্তু ওদের আমি কী করে বোঝাব যে, শাশ্বত যে-সে ছেলে নয়, সে সারা রাত ঘুরে-ঘুরে গুণ্ডা ধরে বেড়ায়। ভাবতাম, একবার সকলকে বলি যে, তোমরা আজকে শাশ্বতকে খারাপ ছেলে বলে বদনাম দিচ্ছ, কিন্তু যখন ও আবার পুলিসের বড় চাকরি করবে, তখন তোমরাই আবার ওকে খোসামোদ করে ওকে মাথায় তুলবে।

তখন আমার খুব কম বয়েস হলেও এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি হয়েছিল। বুদ্ধি হয়েছিল যে, মানুষ বেশির ভাগই স্বার্থপর। যেখানে যে-মানুষের কাছেই তার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি হবে, সেখানেই সে সেই মানুষের পা চাটবে। অথচ সত্যিকারের গুণী মানুষের কোথাও আদর নেই। বিশেষ করে যদি সেই মানুষটা গরীব হয়।

শাশ্বত'রা ছিল গরীব। কিন্তু গরীব হওয়া কি নিন্দের না অপরাধ?

সংসারে টাকা বড়, না গুণ বড়? এই যে শাশ্বত এত বড়, এত গুণী ছেলে, সে সমাজের এত উপকার করছে, এর কি কোনও দাম নেই? তার আর্থিক অবস্থা দেখেই কি লোকে তাকে বিচার করবে?

সত্যিই, যার নিজের মামা পুলিশ কমিশনার, তারা কেন এত খারাপ বাড়িতে থাকবে, এ কথাটা আমারও মাঝে-মাঝে মনে হতো।

দেখতাম, শাশ্বত'র মা নিজের হাতে রান্না করত। ময়লা ছেঁড়া-কাপড় পরে সংসারের কাজ করত। যে-বাড়িটাতে শাশ্বত'রা থাকত, সে বাড়িটাও বস্তির ভেতরে। বোধহয় আট কি দশ টাকা ভাড়া। আমার বাবা-মা-দাদারা কেউই পছন্দ করত না যে, আমি শাশ্বত'র সঙ্গে মিশি। তার একমাত্র কারণ, শাশ্বত'রা গরীব, আর শাশ্বত লেখা-পড়াতেও তেমন ভাল নয়।

লেখা-পড়ায় খারাপ আর গরীব ছেলেদের সঙ্গে কোন বাড়ির বাপ-মা'ই বা তাদের ছেলেদের মিশতে দেয়। আর সত্যিই তো আমার দাদার কি মায়েরও তো অন্যায় নয়। শাশ্বত'র মামা যে কলকাতার পুলিস কমিশনার, তা-তো তারা জানত না। শাশ্বত দুপুরবেলা আমার বাড়ির যে-ঘরে আমি থাকতুম, সেই ঘরের বাইরে এসে চুপি-চুপি ডাকত, 'এই ভোঁদা, ভোঁদা'—

আমি শাশ্বত'র গলার আওয়াজ টের পেয়েই বাইরে বেরিয়ে আসতাম লুকিয়ে-লুকিয়ে। শাশ্বত বলত, 'চল কালীঘাট রেল-ইস্টিশানের দিকে যাই—'

আমি জিজ্ঞেস করতাম 'কেন রে? সেখানে কী আছে?'

শাশ্বত বললে, 'কিছু নেই, এমনি।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কী হয়েছে সত্যি বল তো?'

শাশ্বত বললে, 'মামা আমাকে বকেছে ভাই খুব।'

'কেন?'

'আমি একটা সিল্কের জামা পরেছিলাম, তাই। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, তাই তোর কাছে চলে এলুম।'

ভাগ্নের সিল্কের জামা পরাতে কী এমন অপরাধ হলো, বুঝতে পারলাম না। সিল্কের শার্ট-প্যান্ট আমিও পরতাম। কিন্তু তাতে যে অপরাধ হয়, তা জানা ছিল না। বললাম, 'তোর মামা এসেছিল নাকি তোদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু অনেক রাত্তিরে, যাতে কেউ জানতে না পারে।'

'জানতে পারলে কী ক্ষতি?'

শাশ্বত বললে, 'জানতে পারলে সবাই মামাকে বিরক্ত করবে। মামার কাছে সবাই চাকরি চাইবে। সেইজন্যেই তো আমরা বস্তি-বাড়িতে থাকি। গরীবের মতো করে থাকি। মামাও জানাতে দিতে চান না যে, আমি তার

ভাগ্নে। একমাত্র তোকেই কথাটা বলেছি, কেউ তো জানে না।'

তখন বুঝলাম কেন শাশ্বত ওইরকম বস্তি-বাড়িতে থাকে। জানতে পারলাম, কেন ওই রকম সাদা-সিধে জামা-কাপড় পরে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সিল্কের জামা পরলে দোষ কী?'

শাশ্বত বললে, 'তা আমি তো জানি না ভাই, মামা বলেন যে দেশে এত গরীব, সে-দেশে সিল্কের জামা পরা পাপ। এই বড়লোকদের বিলাসিতা দেখেই তো গরীব লোকদের এত রাগ। এত ডাকাতি, রাহাজানি, খুনোখুনি তো ওইজন্যেই হচ্ছে। একদিকে এত টাকা নষ্ট, আর একদিকে এত অভাব—এ কখনও গরীব লোকেরা সহ্য করতে পারে? তাই তো সব সময়ে দু'দলে মারামারি লেগে আছে, তাই তো এত গুণ্ডাদের অত্যাচার, এত ব্যাঙ্ক-ডাকাতি চলছে। এই সব যত হবে, মামার আর কাজও ততো বাড়বে!'

'কত টাকা দিয়ে জামাটা কিনেছিলি?'

'সত্তর টাকা!'

সত্তর টাকা! আমি চম্‌কে উঠলুম। তখনকার দিনে কুড়ি টাকা দিয়ে ভাল সিল্কের শার্ট পাওয়া যেত। সেই সস্তার দিনে শাশ্বত সত্তর টাকা দিয়ে সার্ট কিনেছিল! তা'হলে কে বললে শাশ্বত'রা গরীব!

'জামাটা তাহ'লে কী করলি? কাউকে দিয়ে দিলি?'

শাশ্বত বললে, 'না, জামাটা ছিঁড়ে ফেললুম। আমার মা-ও জামাটা ছিঁড়ে ফেলতে বললে। মামা যখন আপত্তি করছে, তখন কী করে পরি বল?'

শাশ্বত আর আমি কালীঘাটের রেল-ইস্টিশানের দিকে চলতে লাগলাম। যেতে-যেতে অনেক কথা হতে লাগল আমাদের মধ্যে। আমাদের দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কথা। আমি বারবার ভাবতাম, শাশ্বত'রা আমাদের চেয়ে গরীব, কিন্তু তার পর থেকে আমার সে-ধারণা বদলে গেল। রাস্তায় চলতে-চলতে শাশ্বত অনেক কথা বলত, আর আমি মন দিয়ে তার সমস্ত কথা শুনতাম।

শাশ্বত বলত, 'দেখ, আমি বড়ঘরের ছেলে, ইচ্ছে করলেই তোদের মতো ভাল দামী জামা-কাপড় পরতে পারি। কিন্তু পরি না।'

'কেন, পরিস না কেন?'

শাশ্বত বলত, 'আমার লজ্জা করে।'

'কেন, লজ্জা করে কেন?'

শাশ্বত বলত, 'লজ্জা করবে না? আমাদের দেশে ক'টা লোকের সিল্কের জামা-কাপড় পরবার ক্ষমতা আছে বল তো? যেদিন সবাই ভাল জামা-কাপড় পরবে, সেদিন আমিও ভাল জামা-কাপড় পরব।'

শাশ্বত'র কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম! শাশ্বত তাহ'লে এতও ভাবে? আর তো আমাদের কাউকে এসব কথা বলতে শুনিনি।

শাশ্বত'র কথা শুনে তার ওপর আমার আরও ভক্তি বেড়ে যেত। আমার বাড়িতে আমি বাবা-ম'র কাছ থেকে অনেক টাকা হাত- খরচ হিসেবে পেতুম! আমরা ছিলাম শাশ্বতদের চেয়ে অনেক বড়-লোক। আমার বাবা অনেক বড় চাকরি করতেন। আমার মাথার ওপরে আমার দাদারাও খুব বড় চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িতে অনেক চাকর-বাকর-ঝি-ঠাকুর ছিল। নিজের হাতে আমাকে কখনও কোনও কাজ করতে হত না। এক গ্লাস জল কখনও নিজের হাতে গড়িয়ে খাইনি। নিজের হাতে বাজার তো দূরের কথা। আর সেই আমারই কিনা সবচেয়ে ভাল লাগত শাশ্বতকে!

আমার কাছে সব সময় থাকত দেদার পয়সা। মা আমার হাত-খরচের জন্যে আমাকে প্রায়ই পাঁচটাকার কি দশটাকার একটা নোট দিতেন। সেগুলো ফুরিয়ে গেলে আবার টাকা দিতেন আমাকে। তার জন্যে কখনও বাবা-ম'র কাছে আমাকে দরকার করতে হতো না।

রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে একটা ভিখিরী একটা পয়সা চাইত। আমি হয়তো ভিখিরীটাকে কখনও একটা পয়সা দিতাম।

শাশ্বত দেখতো। বলত, 'ওকে তুই মাত্র একটা পয়সা দিলি?'

আমি বলতাম, 'ও তো একটা পয়সাই চাইলে।'

শাশ্বত রেগে যেত। বলত, 'ও একটা পয়সা চাইলে বলে তুই একটা পয়সাই দিলি? তুই বড় কিপ্‌টে তো!'

আমি বলতাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আছে, আর একটা পয়সা দিচ্ছি—'

শাশ্বত বলত, 'একটা আধুলি দিতে পারিস না? তোর কাছে একটা আধুলি তো মাটি রে!'

আমি লজ্জায় পড়ে যেতুম। ভিখিরীটাকে একটা পুরো টাকাই দিয়ে দিতুম। শাশ্বত তখন আনন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিতো। বলত, 'এই তো, এই রকমই তো করা চাই' গরীবদের দুঃখটা একবার ভাবত শেখ। ওদের ভাল হলে তবেই আমাদের ভাল, তা জানিস? ওরা যে গরীব, তার জন্যে কারা দায়ী জানিস?'

আমি বলতাম, 'না'—

'আমরা। ওরা যে অত গরীব, তার জন্যে এই আমরাই দায়ী। আমরাই ওদের সারা জীবন গরীব করে রেখেছি। ওরা যদি চিরকাল গরীব না থেকে একদিন বড়লোক হয়ে যায়, তাহ'লে আমরাও আর চিরকাল এই রকম

বড়লোক হয়ে থাকতে পারব না।'

আমি শাশ্বত'র কথা ভাবতে লাগলাম। এ-কথাটা তো আমি এতদিন একবারও ভাবিনি। বলতাম, 'তোকে এসব কথা কে শেখালে রে শাশ্বত?'

শাশ্বত বলত, 'আমার মামা।'

'তোর যে-মামা পুলিস কমিশনার?'

'হ্যাঁ, মামা পুলিস কমিশনার হলে কী হবে। মামা গরীবদের দুঃখ যেমন বোঝে, অমন করে কোনও মন্ত্রীও ভাবে না। এই যে আমাদের দেশে এত চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, এ কিসের জন্যে, কাদের জন্যে হচ্ছে? মামা বলেন, 'এসব আমাদের জন্যেই হচ্ছে? আমাদের মতো বড়লোকদের জন্যেই হচ্ছে।'

'তোর মামা নিজে এই কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ-রে, বলবে না? মামা যে নিজের চোখে সব দেখেছেন। মামা নিজে পুলিস কমিশনার হয়েও সারারাত গাড়ি নিয়ে কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। ঘুরে-ঘুরে সব দেখেন। সব দেখে-শুনে মামার এই ধারণা হয়েছে। মামা বলেন, যে-দেশে বড়লোকের সংখ্যা কম আর গরীবদের সংখ্যা বেশি, সেই দেশেই বেশি চুরি-ডাকাতি হয়।'

আমি বলতাম, 'তা তোর মামা নিজে পুলিস কমিশনার হয়ে এই এত চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে পারেন না?'

'পারবেন কী করে? তাহ'লে হয় সব বড়লোকদের গরীব করে দিতে হয়, আর নয় তো সব গরীবলোকদের বড়লোক করে দিতে হয়। তা-তো সম্ভব নয়। সে-সব কাজ তো মামার হাতে নেই।'

কথাগুলো ভাববার মতো। বলতে-বলতে হঠাৎ শাশ্বত একটা বাড়ির থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়তো। আবার খানিক পরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত।

জিজ্ঞেস করতাম 'কী-রে অমন করে থামের আড়ালে লুকোলি কেন?'

শাশ্বত বলত, 'আমার মামা যাচ্ছিলেন রে। ভাগ্যিস দেখতে পাননি।'

আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'কই, কোথায় তোমার মামা?'

'ওই তো, ওই যে একটা গাড়ি চলে গেল, ওর ভেতরেই মামা বসে ছিলেন। ভাগ্যিস আমি লুকিয়ে পড়লাম।'

আমি বুঝতে পারতাম না। জিজ্ঞেস করতাম, 'কেন, দেখতে পেলে কী ক্ষতি হত?'

'আরে তুই জানিস না, দেখতে পেলেই মামা আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতেন আর বকতেন।'

'কেন, বকতেন কেন?

'বকতেন এই জন্যে যে আমি বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছি। মামা চান না, আমি বাজে ছেলের সঙ্গে মিশি।'

'আমি বাজে ছেলে ?'

'আরে তুই বাজে ছেলে হতে যাবি কেন ? মামার ধারণা কলকাতার সব ছেলেই বাজে। এই যে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, এটা মামা মোটে পছন্দ করেন না।'

এরকম প্রায়ই হত, কিন্তু আমরা রাস্তায় ঘোরা তবু বন্ধ করতাম না।

সেদিন শাশ্বতদের বাড়ি গিয়েছি। ছুটির দুপুর। বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলাম, 'শাশ্বত, এই শাশ্বত—'

শাশ্বত'র বিধবা মা সদর-দরজা খুলে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'শাশ্বত নেই ?'

শাশ্বত'র মা বললেন, 'ও, তুমি ? কিন্তু সে-তো বাড়িতে নেই।'

'কোথায় গেছে সে ?'

শাশ্বতর মা বললেন, 'তার মামার বাড়ি।'

আমি চলে আসছিলাম। হঠাৎ শাশ্বত'র মা বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ কেন, বোসো না একটু। সে একঘণ্টার মধ্যে আসবে।'

শাশ্বত'র মা একটু থেমে আবার বললেন 'তার আগেও চলে আসতে পারে। এই রোদ্দুরে তুমি কোথায় ঘুরবে ? তুমি একটু ঠাণ্ডায় ঘরের মধ্যে বসে আরাম করো।'

আমি আর কী করবো। ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরে একটি তক্তপোষ, তার ওপরে মাদুর পাতা। সেই মাদুরের ওপরেই শাশ্বত'র মা এতক্ষণ শুয়েছিলেন। সারা বাড়িতে ওই একখানাই মাত্র ঘর। মাথার ওপরে ইলেকট্রিক ফ্যান-ট্যান কিছু নেই। তা হোক, শাশ্বত আর মা ওই তক্তপোষের ওপরেই রাত্তিরে শুতো। অথচ আমাদের বাড়িতে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে মাথার ওপরে ফ্যান। তবু আমার ভাল লাগত শাশ্বতদের বাড়িটা।

'আমাকে এক গেলাস জল দেবেন মাসিমা ?'

'হ্যাঁ, দিই'—বলে একটা কলাই করা গেলাসে জল নিয়ে এলেন মাসিমা। আমি জল খেলাম।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ গো বাবা, তুমি যে আমাদের বাড়ি যখন-তখন আসো, তাতে তোমার বাবা-মা কিছু বলেন না ?'

'কেন, কিছু বলবে কেন ?'

'না, তুমি তো আমার শাশ্বত'র চেয়ে ভাল ছেলে, তাই বলছি।'

আমি বললাম, 'কে বললে শাশ্বত আমার চেয়ে খারাপ ছেলে ?'

মাসিমা বললেন, 'কী জানি বাবা, সারাদিনই তো ও টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। কখন যে লেখা-পড়া করে তা-তো জানি না।'

আমি বললাম, 'দেখে দেবেন, শাশ্বত একদিন খুব বড় হবে। ওর মতন বুদ্ধি আমাদের ক্লাসের মধ্যে কারও নেই। ওর অত বুদ্ধি বলেই তো আমি সবাইকে ছেড়ে ওর সঙ্গে মিশি।'

'কিন্তু বাবা, ও তো পড়ে না মোটে। আমি ওকে কতবার পড়তে বসতে বলি। কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। বড্ড একগুঁয়ে ছেলে ও। যা মনে করবে, তাই-ই করবে। কারও কথা মানবে না। তুমি ওর এত বন্ধু, তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পারো না।'

আমি মাসিমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। শাশ্বত'র যে কত বুদ্ধি, তা-তো মাসিমা জানেন না। বললাম, 'শাশ্বত আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান, আপনি তো জানেন না। ও আমাকে সব কিছু শেখাতে পারে।'

মাসিমা বললেন, 'ছাই পারে, আমার ভাগ্য যদি অত ভাল হবে, তা'হলে আমার এত ভাবনা। ওর জন্যেই আমার এত জ্বালা। ও যখন জন্মাল, তখনই তোমার মেসোমশাই মারা গেলেন। তখন থেকেই আমার কপাল পুড়েছে!'

আমি মাসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমি বলছি দেখবেন, একদিন ওই শাশ্বত আপনার সব দুঃখ ঘোচাবে।'

'ছাই ঘোচাবে, ওর যদি অতই বুদ্ধি হতো, তা'হলে আমার দুঃখটা বুঝত। আমি যে বাবা কী কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছি, তা-তো ও জানে না।'

আমি বলতাম, 'তা-না জানুক,বড় হয়ে দেখবেন ও খুব বড় চাকরি করবে। মানুষ তো স্কুল-কলেজের ডিগ্রী দিয়ে বড় হয় না, বড় হয় তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে। সেই সাধারণ বুদ্ধি ওর খুব আছে। আমি ওর সঙ্গে তো ওই জন্যেই মিশি। ওর কাছ থেকে অনেক শিখতে পারি—'

মাসিমা বলতেন, 'আমি তো ভগবানের কাছে সারাদিনই সেই প্রার্থনাই করি। আমি শুধু ভাবি ও মানুষ হোক, আমি নিজের জীবনে যে-কষ্ট পেয়ে গেলুম, ও যেন বড় হয়ে সে-কষ্ট না পায়—'

আমি বলতাম, 'দেখবেন আপনি, ও সে কষ্ট পাবে না। আপনি মিছি-মিছি ওইসব ভাবছেন।'

মাসিমা বলতেন, 'ভাবব না ? তুমি বলছ কী ? ও যে মোটে লেখা-পড়া

করে না, দিন-রাত কেবল কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, কেউ জানতে পারে না। ওকে জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। স্কুল থেকে এসেই কোথায় বেরিয়ে যায়।'

আমি বলতাম, 'ইস্কুল থেকে ফিরে এসে শাশ্বত আর আমি দু'জনে এক সঙ্গেই বেড়াতে যাই—'

'তারপর ? তারপর বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা মাষ্টারমশাই আসেন, তাঁর কাছে পড়তে বসি।'

মাসিমা বলতেন, 'তুমি তো তোমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসো, আর ও তারপর কী করে জানো ?'

'না, তারপর ও-ও তো পড়তে বসে।'

মাসিমা বলতেন, 'না, পড়তেই যদি বসবে, তাহ'লে তোমার কাছে বলছি কী ? ও তখন জলখাবার খেয়ে আবার বেরোয়।'

'আবার বেরোয় ? কোথায় বেরোয় ?'

'ভগবান জানে! আমাকে কিছু বলে না।'

'তারপর কখন বাড়ি ফেরে ?'

মাসিমা বলতেন, 'সে অনেক রাতে। আমি তখন ভাত কোলে করে বসে থাকি। জিজ্ঞেস করি যদি যে, কোথায় গিয়েছিলি তো জবাব দেবে 'তুমি জেনে কী করবে ?' শুনলে ছেলের কথা ?'

আমি আর মাসিমাকে কিছু বলতুম না। আমি তো জানতুম, শাশ্বত কোথায় যায়। শাশ্বত তো আমাকে নিজেই বলেছে যে, সে গুপ্তি-সড়কি নিয়ে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা ধরতে সারারাত কলকাতার রাস্তার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সে সব কথা মাসিমাকে বলা যায় না। ও-সব শাশ্বত বিশ্বাস করে আমাকে বলেছে শুধু আমার জন্যেই। মা'কে সে-সব কথা বললে শাশ্বত'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

যখন দেখলাম এখনও শাশ্বত ফিরছে না, তখন উঠতাম। বলতাম, তাহ'লে আমি চলি মাসিমা, মামার বাড়ি থেকে ফিরে এলে বলবেন আমি এসেছিলুম।,

'হ্যাঁ, বলব। তুমি আর কতক্ষণ তার জন্যে বসে থাকবে। তোমারও তো লেখা-পড়া আছে।'

আমি চলেই আসছিলাম, হঠাৎ একজন অচেনা লোক এসে হাজির হল। বললে, 'মা-জননী আছেন নাকি ?'

মাসিমা এগিয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, কে ? ও আপনি এসে গেছেন ?'

লোকটা বললে, 'হ্যাঁ আপনি তো আজই আমাকে আসতে বলেছিলেন মা-জননী।'

মাসিমা বললেন, 'তা-তো বলেছিলাম, কিন্তু আমি সে-কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।'

লোকটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো সবই বোঝেন মা-জননী, আপনি তো জানেন, আমি ছা-পোষা মানুষ। এই বাড়ি-ভাড়ার টাকাতেই আমার সংসার-ধর্ম সব কিছু চলে। আজ তিনমাস হয়ে গেল, আপনি একটাকাও দিলেন না, আমার পেট কী করে চলে, সেইটেই একবার ভেবে বলুন মা-জননী।'

মাসিমা যেন খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। লোকটা বললে, 'অন্ততঃ আজকে যদি এক মাসের ভাড়াটাও দিতেন তো বড় উপকার হত আমার—'

মাসিমা মুখ কালো করে বললেন, 'কিন্তু আমার হাতে তো বাবা একটা পয়সাও নেই এখন। আমার ভাই এখনও টাকা দিয়ে যায়নি। আমার ছেলেকে তাই আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছি টাকা আনবার জন্যে। আমি তো তার পথের দিকেই চেয়ে বসে আছি—'

মাসিমার ভাই মানে শাশ্বত'র মামা। শাশ্বত'র মামাই তো পুলিস কমিশনার। তার বোন তিন মাসের বাড়ি ভাড়া দিতে পারছেন না, এটা তো পুলিস কমিশনারের বোঝা উচিত।

লোকটা বললে, 'দেখুন না চেষ্টা করে যদি এক মাসের বাড়ি ভাড়াটাও দিতে পারেন। আমি যে আবার আবার আর-একজনকে কথা দিয়েছি। সে ভদ্রলোককে আবার খালি হাতে ফেরত দিতে হবে।'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনছিলাম। এবার মাসিমার দিকে চেয়ে বললাম, 'একমাসের ভাড়া কত টাকা মাসিমা?'

মাসিমা কিছু বলবার আগেই লোকটা বললে, 'দশ টাকা—'

আমি বললাম, 'আমার কাছে দশ টাকা আছে, আমি দিয়ে দেব মাসিমা?'

'তুমি দেবে?'

লোকটা বললে, 'ও দিক না এখন, পরে না-হয় ওকে দিয়ে দেবেন।'

আমি এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে লোকটাকে দিলাম। লোকটা টাকাটা ছোঁ মেরে নিজের পকেটে পুরে ফেললে। পুলিশ কমিশনারের বোনের অপমান হবে, এ আমি নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না।

আমি সেদিন সেখানে আর দাঁড়ালাম না। সোজা বাড়ি চলে এলাম। টাকাটা শাশ্বতদের বাড়িওয়ালাকে দিয়ে মনে খুব তৃপ্তি পেলাম।

ক'দিন ধরে আর শাশ্বত'র দেখা পেলাম না। অত বড়লোক মামা, সেখানে গিয়ে বোধহয় খুব আরামে কাটাচ্ছে সে। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে খবর নিতাম। দরজার কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'মাসিমা, শাশ্বত এসেছে?'

মাসিমা দরজা খুলে গিয়ে বললেন, 'না বাবা, সে তো আসেনি।'

আমি বললাম, 'এখনও আসছে না কেন সে?'

মাসিমা বলতেন, 'গরমের ছুটি রয়েছে তো, তাই সেখানে থেকে বোধহয় আরাম করছে।'

আমার গরমের ছুটি চলছে তখন। কিন্তু আমার তখন আরাম নেই। আমার তো আর কোনও বন্ধু-বান্ধব ছিল না। ক্লাসের মধ্যে শাশ্বত ছাড়া কারও সঙ্গে মিশে আনন্দ পেতাম না। আমি একলা-একলা ঘুরে বেড়াতাম। বাড়িতে বেশিক্ষণ-থাকতে ভাল লাগত না।

মা বকতেন, বলতেন 'ওর সঙ্গে অত ভাব কেন? ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে?'

আমাদের বাড়ির কেউ শাশ্বতকে পছন্দ করত না। তাই শাশ্বতকে 'ছোঁড়া' বলত সবাই। শাশ্বত' কে বাড়ির লোকেদের পছন্দ না হওয়ার কারণ, ও লেখা-পড়ায় ভাল ছিল না। লেখা-পড়ায় খারাপ হওয়া যতটা খারাপ, তার চেয়ে বেশি খারাপ গরীব হওয়া। আমার বাড়িতে মা-বাবা-দাদারা কেউই গরীব লোকেদের দেখতে পারতেন না। আমি সেটা বুঝতে পারতাম। তাই আমি চাইতাম না, যে শাশ্বত আমাদের বাড়িতে আসুক। আমার সামনে শাশ্বতকে কেউ অপমান করবে, এ আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারতাম না। এসব কথা আমি শাশ্বতকে মুখেও বলতাম।

শাশ্বত বলত, 'আমাকে কেউ ঘেন্না করলে আমার বয়ে গেছে। তুই জানিস, আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

আমি বলতাম, 'তা-তো জানি। কিন্তু তোকে কেউ অপমান করলে আমার মোটে সহ্য হয় না। আমার বাড়ির লোকেরা তোকে দেখতে পারে না, স্কুলের মাস্টাররা তোকে কেউ পছন্দ করে না, এতে আমার যে খুব খারাপ লাগে।'

শাশ্বত বলত, 'তাহ'লে তুইও আমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দে। তুই-ই বা কেন মিশিস? না মিশলেই পারিস। আমার তাতে কোনও ক্ষতি নেই।'

শাশ্বত এই রকমেরই ছেলে। বড় অভিমানী ছিল সে।

সে বলত, 'আমি আপন মনে নিজের কাজ করে যাব। তাতে কারও ভাল লাগুক আর খারাপই লাগুক, তাতে আমার কী এসে যায়? আমি জানি আমি কখনও অন্যায় করিনি, অন্যায় করবও না।'

আমি শাশ্বতর কথাগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতুম। আর সেই সঙ্গে নিজেও শাশ্বত'র মতো হতে চেষ্টা করতাম। এক-এক সময়ে শাশ্বত রেগে যেত। বলত, 'দ্যাখ্ আমি জানি তোরা সবাই আমাকে ঘেন্না করিস।'

আমি বলতাম, 'অন্য সবাই হয়তো ঘেন্না করে, কিন্তু আমি তোকে ঘেন্না করি না। ভগবানের নামে দিব্যি করে বলতে পারি, তুই বিশ্বাস কর।'

শাশ্বত বলত, 'কেন, তুই আমাকে ঘেন্না করিস না কেন? আমার মধ্যে তুই এমন কী পেয়েছিস?'

আমি বলতাম, 'তোকে আমি যে খুব ভালবাসি। সেটা তুই বুঝতে পারিস না?'

শাশ্বত বলত, 'তুই ঘেন্না করলেও তাতে কিছু আসবে-যাবে না। এ পৃথিবীতে যে সব-কিছু সহ্য করতে পারে, সে-ই থেকে যায়।'

'এ কথা তোকে কে বললে?'

শাশ্বত বললে, 'আমার মামা। মামা বলেছে, একদিন পৃথিবীতে গরীবদেরই জয়-জয়াকার হবে। আর বড়লোকেরা সব নীচে নেমে যাবে। তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। দেখিসনি, আমাদের পাড়ায় ওই যে নাজিরদের মস্ত বড় ভাঙা বাড়ি রয়েছে। একদিন ওদের খুব পয়সা ছিল। ওদের গাড়ি ছিল, গেটে বন্দুক নিয়ে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত, ওদের বাড়ির ছেলেরা খুব বাবুয়ানি করত, এসব আমার শোনা কথা। কিন্তু আজ? আজ ভাইতে-ভাইতে মামলা, এ ওর মুখ দেখে না, খাবার আলাদা হাঁড়ি, এ সব কেন হল?

আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'কেন হল রে?'

শাশ্বত বলত, 'বেশি বড়লোক হলে ওই রকমই হয়।'

আমি বলতাম, 'আমরা? আমরাও কি ওই রকম হয়ে যাব? আমাদেরও কি ভাইতে-ভাইতে মামলা হবে?'

'বেশি টাকা হলে তোদেরও ওইরকম হবে।'

তারপর একটু থেমে বলত, 'সেই জন্যেই তো মামা বলেন বেশি টাকা হলে লোক কাজ-কর্ম করতে চায় না, কেবল আড্ডা মেরে-মেরে বেড়ায়। তাতেই তাদের সর্বনাশ হয়। আমিও তাই বেশি টাকা চাই না—'

সত্যিই শাশ্বত'র জামা-কাপড়ের বাহার ছিল না। সাধারণ আধ-ময়লা শার্ট পরেই চালিয়ে দিতে সব সময়ে। কিন্তু আমার বাড়িতে অন্য ব্যবস্থা ছিল একটা শার্ট দু'দিন পরলেই মা রাগারাগি করতেন! সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য ফর্সা শার্ট পরতে বাধ্য করতেন। বলতেন, 'ও-রকম ময়লা শার্ট রোজ-রোজ পরলে লোকে বলবে এদের পয়সা নেই, এরা গরীব।'

আমি মাকে বলতাম, 'গরীব বললে ক্ষতি কী? গরীব হওয়া কি দোষের?'

মা বলতেন, 'দোষ নয় কী? গরীবদের কেউ ভাল নজরে দেখে?'

আমি বলতাম, 'কেন, আমার বন্ধু শাশ্বত তো আধ-ময়লা জামা-কাপড় পরে সেটা কি খারাপ? ওই তো আমাদের পাড়ার নাজিরেরা এককালে কত বাবুয়ানি করেছিল, এখন কি সে অবস্থা আছে?'

মা জিজ্ঞেস করতেন, 'এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে? ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটা নিশ্চয়?'

আমি সগর্বে বলতাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যা ভাবছ ও তা নয়। ও গরীব হতে পারে, কিন্তু বাউণ্ডুলে মোটেই নয়। ওরা খুব বড়লোক। ওইরকম সাদাসিধে ভাবে থাকে তাই তুমি ওই কথা বললে। ওর মামা কে জানো?'

মা বলতেন, 'জেনে আমার দরকার নেই। আমি যা চু'চক্ষে দেখতে পারি না তাই-ই হয়েছে আমার ছেলে।'

বাবা একদিন আমাকে ধরলেন। বললেন, 'এসব কী শুনছি? তুমি নাকি যার-তার সঙ্গে মেশো। খবরদার বলছি, যার-তার সঙ্গে মিশো না, ওতে স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। যারা লেখা-পড়ায় ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়, কেবল তাদের সঙ্গেই মিশবে। আর মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। যাও—'

বাবার বকুনি চুপ করে সহ্য করলাম। মুখে কিছু বললাম না। কিন্তু মনে-মনে বড় কষ্ট পেতে লাগলাম। শাশ্বত'র বাইরেটাই সবাই দেখে, কিন্তু ভেতরটা কেউই দেখলে না। সে যখন একদিন ভবিষ্যতে বড় হবে, তখন তোমরাই আবার ওকে বাহবা দেবে। তখন তোমরাই সবাই ওর গুণগান করবে। তোমাদের সমাজের এই-ই নিয়ম।

সেদিন একটু ফাঁক পেতেই শাশ্বতদের বাড়িতে গেলাম। আমার ডাক শুনেই শাশ্বত বাইরে বেরিয়ে এল। বললে, 'কী রে, এত সকালে? কী হয়েছে?'

আমি আমার একটা শার্ট সঙ্গে করে লুকিয়ে এনেছিলাম।

বললাম, 'তোকে এই শার্টটা দিতে এলাম।'

'কেন?' শাশ্বত অবাক হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'তোর জন্যে আমার বাবার কাছ থেকে কাল খুব বকুনি খেতে হয়েছে। তুই ময়লা শার্ট পরিস্ বলে আমার মা-বাবা চু'জনেই যাচ্ছেতাই করে আমাকে খুব কথা শুনিয়েছে।'

শাশ্বত আমার কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল। তার সে হাসি আর থামতেই চায় না। আমাদের কথার আওয়াজ শুনে মাসিমাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'কী হয়েছে রে খোকা? তোর এত হাসি কিসের?'

শাশ্বত বললে, 'এই দেখ না মা, বিনু আমাকে ওর একটা শার্ট দিতে এসেছে।'

মাসিমা অবাক হয়ে গেলেন ছেলের কথা শুনে। বললেন, 'শার্ট ? কিসের শার্ট ? পুরনো না নতুন ?'

শাশ্বত বললে, 'পুরনো। ওর নিজের পরা। আমি ময়লা শার্ট পরার জন্যে ওকে নাকি ওর বাবা-মায়ের কাছে খুব বকুনি খেতে হয়েছে।'

'কেন, তুই ময়লা পরিস, তারজন্যে ওর বাবা-মা বকলেন কেন ?'

এতক্ষণ আমি কিছুই বলিনি। এবার বললাম 'মাসিমা, শাশ্বত ময়লা জামা মোটে পরতে দেবেন না। এদিকে আমি ফর্সা জামা পরবো, আর ও আমার বন্ধু হয়ে ময়লা জামা পরে থাকবে এ আমার মোটে ভাল লাগে না।'

শাশ্বত মায়ের দিকে চেয়ে বললে, 'জানো মা, বিনুটা আস্ত পাগল।'

বলে আবার আগেকার মত হো-হো করে হাসতে লাগল।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁ রে, তুই ভেবেছিস ফর্সা জামা-কাপড় পরলেই মানুষ ভদ্রলোক হয়ে যায় ? ফর্সা জামা-কাপড় দিয়ে সংসারে মানুষের বিচার হয় ? তা যদি হতো, তা'হলে তো চোর-ডাকাত-জুয়োচোর সবাই ভদ্রলোক রে। ও জামা আমি নেব না। তুই যেমন নিয়ে এসেছিস, তেমনি ফিরিয়ে নিয়ে যা। তোর বাবা-মা'কে বলিস, আমি ইচ্ছে করলে তোদের মত ফর্সা জামা-কাপড় পরতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু কেন পরব ? যেদিন আমাদের দেশে গরীব মানুষ বলে কেউ থাকবে না, যেদিন সবাই ফর্সা জামা-কাপড় পড়তে পাবে, সেদিন আমিও ফর্সা জামা-কাপড় পরব। যা তুই এখন—'বলে শাশ্বত বাড়ির ভেতর চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু মাসিমা বললেন, 'ওরে খোকা, তুই ওর ওপর রাগ করছিস কেন ? আহা ও তোকে কত ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তোকে শার্ট দিতে এসেছে, আর তুই এইরকম করে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস ? ওর মনে কত কষ্ট হচ্ছে, বল তো ?'

বলে আমার দিকে চেয়ে মাসিমা বললেন, 'দাও বাবা দাও, শার্টটা দাও, তুমি কিছু মনে করো না। ও ওমনি বড্ড একগুঁয়ে।'

আমি মাসিমার হাতে আমার দামী শার্টটা তুলে দিয়ে যেন একটু স্বস্তি পেলাম। মনে হল, এ শার্টটা পরলে কেউ আর ওকে আগের মতো তাচ্ছিল্য করবে না, গরীব বলে ঘেন্নাও করবে না। শার্টটা মাসিমার হাতে দিয়ে বললাম, 'শাশ্বতকে বলবেন ও যেন এটা পরে, যেন ছুঁড়ে ফেলে না দেয়।'

মাসিমা বললেন, 'না-না, ওর কথায় কিছু মনে করো না বাবা তুমি, ও শার্ট

পরবে। আমার ওপর তুমি ছেড়ে দাও, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক ওকে পরিয়ে ছাড়বো—' এই বলে শার্টটা নিয়ে মাসিমা ভেতরের দিকে একবার উঁকি-ঝুঁকি মারলেন।

আমি আমার বাড়ির দিকে চলে আসছিলাম। বস্তিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ব, এমন সময়ে পেছন থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ পেলাম, 'ও বাবা, শোনো—'

আমি পেছন ফিরে দেখে অবাক। দেখি মাসিমা তাড়াতাড়ি আমার দিকেই আসছেন। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বললাম, 'আমাকে ডাকছিলেন মাসিমা ?'

মাসিমা একেবারে আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলাটা নামিয়ে বললেন, 'শার্ট তো দিলে, কিন্তু আর একটা কথা বলব তোমাকে বাবা ?'

আমি বললাম, 'কী, বলবেন বলুন না আপনি।'

আমি তখনও বুঝতে পারিনি মাসিমা আমাকে কী বলতে চান।

মাসিমা বোধ হয় একটু দ্বিধা করছিলেন। আমি আবার বললাম, 'বলুন না মাসিমা, বলুন ? কী বলছিলেন বলুন না—'

মাসিমা বললেন, 'বলো আগে, তুমি আমার কথা রাখবে ?'

আমি বললাল, 'নিশ্চয়ই রাখব, বলুন আপনি—'

মাসিমা তেমনি গলা নীচু করেই বললেন, 'খোকাকে যেন তুমি কিছু বোলো না বাবা। ও জানতে পারলে আবার ভীষণ রাগ করবে। জানো ও কীরকম একরোখা একগুঁয়ে ছেলে।'

আমি বললাম, 'না শাশ্বতকে বলব না 'আপনি কী বলবেন বলুন না।'

মাসিমা বললেন, 'শার্ট তো ওকে দিলে বাবা, তোমার একটা প্যান্ট দিতে পারো? ওর সব প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে। তা কেনবার পয়সাও নেই আমার হাতে। যদি ছ'টো প্যান্ট দিতে পারো তো আরও ভাল হয়।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে মাসিমা আমি দেব, আপনি কিছু ভাববেন না, ওর আর আমার মাপ তো একই, আমি প্যান্ট নিয়ে এসে আপনাকে দিয়ে যাব।'

মাসিমা বললেন, 'কিন্তু দেখো বাবা, ও যেন টের না পায়। টের পেলে না, তখন তুমি এসে আমার হাতে চুপি-চুপি দিয়ে যেও—'

বললাম, 'ঠিক আছে মাসিমা, আপনি কিছু ভাববেন না। যা করবার আমি তা করব।'

'কিন্তু তোমার বাবা-মা ?'

বললাম, 'আমার বাবা-মাও কিছু জানতে পারবে না।'

বলে চলে আসছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে মাসিমা আবার ডাকলেন— 'শোনো বাবা, আর একটা কথা শোনো।'

আমি পেছন ফিরে দাঁড়ালাম।

মাসিমা বললেন, 'সেদিন বাড়িভাড়ার জন্যে যে দশটা টাকা দিয়েছিলে, সেটা কিন্তু এখন শোধ দিতে পারব না বাবা। আমার হাত একেবারে খালি। আসছে মাসে মাইনেটা পেলেই তোমাকে দিয়ে দেব।'

'মাইনে?' মাইনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসিমা কি তবে চাকরি করেন নাকি কোথাও?

মাসিমা বললেন, 'আমি পাশের বাড়িতে চাকরি করি কিনা।'

আমি আকাশ থেকে পড়েছি তখন একেবারে। এতদিন তো একথা জানতাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চাকরি করেন?'

মাসিমা বললেন, 'চাকরি না করলে চলবে কী করে বাবা?'

বললাম, 'আমি তো জানতাম না। শাশ্বত তো সে-কথা কখনও বলেনি—'

মাসিমা বললেন, 'খোকা তো জানে না সে-কথা।'

'শাশ্বত জানে না?'

'ও জানলে তো তুমিও জানতে পারতে। বাইরের কেউই তেমন জানে না। খোকা জানতে পারলে খুব রাগ করবে বলে ওকেও কিছু বলিনি। আর সে কেবল নামে মাত্র চাকরি। ঠিক চাকরি বলতে যা বোঝায় তা নয়। ওই আমাদের বাড়ির কাছেই এককালের জমিদার নাজিরদের বাড়ি, তাদের সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, শুধু একজন শরিকেরই অবস্থাটা একটু ভাল। তারা নিজেরা কল-কারখানা করে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে। তাদের বাড়িতেই আমি একটা চাকরি পেয়েছি—'

মাসিমার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি সেখানে ঝি-য়ের কাজ করেন নাকি?'

'না-বাবা, অত খারাপ চাকরি নয়। তাদের বাড়ির এক বউ আমাকে খুব যত্ন করে। আমার অবস্থা দেখে ওই কাজ দিয়েছে।'

'কী কাজ করতে হয় আপনাকে?'

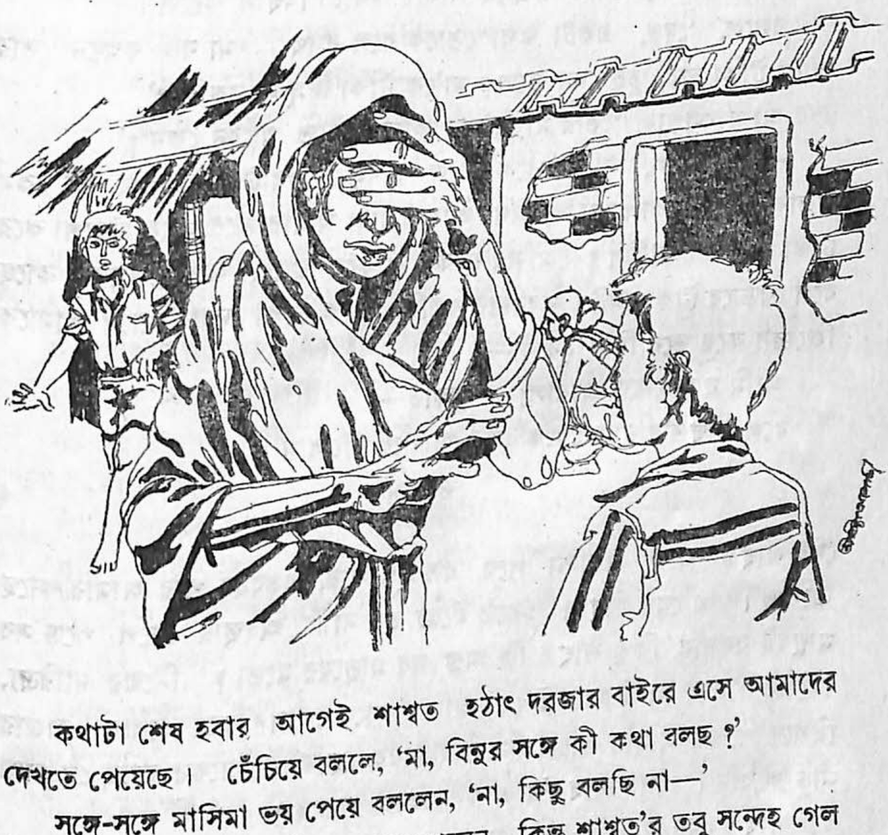
মাসিমা বললেন, 'বউয়ের চুল বেঁধে দিই, পায়ে আলতা মাখিয়ে দিই, আর সাবান দিয়ে গা ঘষে চান করিয়ে দিই। এসব কাজ বউ নিজেই পারে, কিন্তু আমাকে সাহায্য করার নাম করে একটা কাজও দিয়েছে। তার বদলে মাসে তিরিশটা টাকা দেয় আমার হাতে। আর আমিও তা হাত পেতে নিই।

তার থেকে দশ টাকা চলে যায় বাড়ির ভাড়া, আর হাতে থাকে কুড়িটা টাকা। তা তুমি বুঝবে না, আজকাল কুড়ি টাকাতেও কিছুই হয় না।'

'কিন্তু শাশ্বত'র মামা কিছু সাহায্য করে না?'

'আমার ভায়ের অবস্থা খারাপ নয়, ভালই। কিন্তু তাদের সাহায্য নেবই বা কেন? কারও কাছে হাত পাততে যে কী লজ্জা, তা আমার চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানে না বাবা।'

তারপর একটু থেমে পেছন ফিরে দেখে নিয়ে বললেন 'তুমি যেন এসব কথা খোকাকে কিছু বোলো না বাবা। ও কিছুই জানে না। তোমাকেও বলতাম না। তুমি যে বাড়িওয়ালাকে দশটা টাকা দিয়েছে, তা আমি এখন দিতে পারছি না বাবা, দিতে একটু দেরি হবে। বড্ড টানাটানি চলছে এখন।'



কথাটা শেষ হবার আগেই শাশ্বত হঠাৎ দরজার বাইরে এসে আমাদের দেখতে পেয়েছে। চেঁচিয়ে বললে, 'মা, বিনুর সঙ্গে কী কথা বলছ?'

সঙ্গে-সঙ্গে মাসিমা ভয় পেয়ে বললেন, 'না, কিছু বলছি না—' বলে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন, কিন্তু শাশ্বত'র তবু সন্দেহ গেল না। সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'মা কী বলছিল রে তোকে?'

বললাম, 'না, এমন কিছু না।'

'কিছু না মানে? নিশ্চয় কিছু বলছিল। নইলে শুধু-শুধু কেউ বাড়ির বাইরে এসে আড়ালে তোর সঙ্গে কথা বলে?'

বললাম, 'এমনি কোনও কথা না, তোর মামার কথা হচ্ছিল।'

'তা আমার মামার কথা তোর সঙ্গে হচ্ছিল কেন?'

আমি বললাম, 'এই তোর মামা কী রকম বড়লোক, এত-বড় চাকরি করে, এই-সব কথা বলছিলেন তোর মা।'

শাশ্বত বললে, 'তা আমার মামা কত-বড় চাকরি করে, সে-কথা তোর কাছে বলে মায়ের লাভ কী।'

আমার মনে হল, শাশ্বত বোধহয় আমার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু মাসিমার কাছে আমি কথা দিয়েছি তাঁর কথাগুলো কিছুই বলব না।

তাই বললাম, 'বিশ্বাস কর তুই, আর কিছু কথা হয়নি।'

শাশ্বত বোধহয় সৌভাগ্যক্রমে আমার কথাটা বিশ্বাস করলে।

বললে, 'দেখ, একটা কথা তোকে বলে রাখি। মা যদি কক্ষনো তোর কাছে টাকা চায়, তুই যেন ভুলেও মা'কে টাকা দিস্‌নি, বুঝলি?'

আমি বললাম, 'তোর মা আমার কাছে চাইতে যাবেন কেন?'

শাশ্বত বললে, 'না, তোকে বলে রাখলুম কথাটা। মায়ের ওই রকম স্বভাব আছে টাকা চাওয়ার, অথচ আমার মামা আমার জন্যে মাসে চারশো করে টাকা দেয়, তা জানিস? মা সব টাকা লুকিয়ে রাখে, আর লোকের কাছে বলে বেড়াবে টাকা নেই। খবরদার বলছি, মা'কে টাকা দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে তবে দিবি বুঝলি—'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'বুঝেছি—'

বলে শাশ্বত'র হাত থেকে যেন পালিয়ে বাঁচলাম।

সেই শাশ্বত আজ এতদিন পরে, এত যুগ পরে, এতবছর পরে আমার কাছে এসেছে। এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অবস্থার চাপে পড়ে সব মানুষই বদলায়, কিন্তু শাশ্বত কি অন্য সব মানুষের মতো? নিজের দারিদ্র্য, নিজের হীনতা সে চিরকালই তো আমার কাছে গোপন করে এসেছে। হাজার বিপদে পড়েও আমার কাছে, কিংবা বাইরের কোনও লোকের কাছে সে মাথা নীচু করেনি। সেই শাশ্বত'র এ কী চেহারা হয়েছে!

শাশ্বত যেন কী বলি-বলি করেও বলতে পারছিল না।

কিন্তু তার আগেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই চা খাবি?'

শাশ্বত সহজেই মাথা মেড়ে স্বীকৃতি জানালে।

অথচ এককালে কত অহঙ্কার ছিল এই শাশ্বত'র।

মনে আছে, একদিন তাকে নিয়ে ভবানীপুরের দিকে গিয়েছিলাম।

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কিছু খাবি?'

শাশ্বত বললে, 'তুই নিজে খাবি তো খা। আমার খিদে পায়নি, আমি খাব না।'

শাশ্বত'র মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে যেন একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে দেখছ। যেন এরকম তৃতীয় শ্রেণীর রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকতে তার ঘেন্না হচ্ছে।

অথচ দু'দিন আগে শাশ্বতদের বাড়িতে গিয়ে দেখি শাশ্বত'র মা জ্বরে অঘোর হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন। বাড়িতে শাশ্বত নেই।

আমি গিয়ে ডাকলাম, 'মাসিমা—'

আমার ডাকে মাসিমা চোখ তুলে চাইলেন। দেখলাম, মাসিমার চোখ দু'টো লাল জবা ফুলের মতো। মাসিমা বললেন, 'কে বাবা, বিনু?'

'হ্যাঁ মাসিমা, আমি বিনু। আপনার কি হয়েছে? জ্বর হয়েছে?'

মাসিমা কোনওরকমে বলতে পারলেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমি দু'দিন ধরে আর উঠতে পারছি না। সারা শরীরে বাতের মতো ব্যথা।'

মাসিমার কপালে হাত দিতেই হাতটা যেন পুড়ে গেল।

বললাম, 'আপনার কপাল তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।'

মাসিমা বললেন, 'আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বাবা। মরে গেলেই তো বাঁচি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শাশ্বত কোথায়?'

মাসিমা সেই রকম কাঁপতে-কাঁপতেই বললেন, 'কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে। তার জন্যে ভেবে-ভেবেই তো আমার এত জ্বালা। সে মরলে আমি বাঁচি, আমি মরলেও সে বাঁচে।'

আমি বললাম, 'আপনি একটু কষ্ট করে শুয়ে থাকুন, আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি। আজ সকালেও তো শাশ্বতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কত গল্প করেছি অনেকক্ষণ ধরে, কই আপনার অসুখের কথা কিছু বলেনি, আশ্চর্য!'

মাসিমা বললেন, 'ও ওই রকম। ওর বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না। আমিও উঠে ভাত রাঁধতে পারছি না, বাজার করতে পারছি না, নাজিরদের বাড়ি কাজেও যেতে পারছি না, ও-ও তাই। ও-ও দু'দিন ধরে ভাত খেতে পাচ্ছে না তা জানো?'

'তা ও বলছিল, ওর মামা আপনাকে মাসে চারশো টাকা দেয়।'

'সব বাজে কথা। ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো? মাসে চারশো টাকা দেবার ক্ষমতা আছে আমার ভায়ের? সে-ই বলে মাসে কেরানী-গিরি করে আড়াইশো টাকা মাইনে পায়। তারই বলে নিজের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সে দেবে আমাকে টাকা? চারটে টাকা দেবার ক্ষমতা নেই তার, আর সে দেবে আমায় চারশো টাকা।'

আর বেশি কথা বাড়ালাম না। তাড়াতাড়ি একজন পাড়ার ডাক্তার এনে মাসিমাকে দেখলাম। তারপর ওষুধ কিনে এনে মাসিমাকে খাওয়ালাম। তারপর অনেকক্ষণ পাশে বসে মাসিমার মাথা টিপে দিতে লাগলাম।

মাসিমা বললেন, 'তুমি যা করলে আমার নিজের ছেলেও তা জীবনে কখনও করেনি। কী আর বলবো তোমাকে। তোমার উপকারেও কথা, আমি জীবনে ভুলব না বাবা। তুমি যে বাড়িভাড়ার দশটা টাকা সেবার দিয়েছিলে, সে আমি শোধ করবই। আর এই যে ডাক্তার-খরচ, ওযুধ-খরচ, এটাতেও তোমার কত খরচ হল আমাকে বোলো, এও শোধ করে দেব আমি বাবা। আমি তোমার ধার রাখব না, আগে আমাকে বাবা তুমি একটু উঠে দাঁড়াতে দাও—'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আপনি এসব কথা বলবেন না। আগে আপনি ভাল হয়ে উঠুন।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকবে বাবা, তুমি এবার তোমাদের বাড়ি যাও, তোমার বাবা-মা আবার ভাববে।'

আমি বললাম, 'আমি কাল আবার আসব'খন, এখন আসি মাসিমা। দরকার হলে আবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসব।'

বলে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। বেলা হয়ে গিয়েছিল খুব। রবিবার। দেখি উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে শাশ্বত আসছে। চেহারাটা শুকনো-শুকনো। দেখেই বোঝা যায়, দু-তিন দিন ভাত খায়নি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, কোথায় গিয়েছিলি?'

শাশ্বত বললে, 'নাটোরের মহারাজার বাড়ি থেকে আসছি—'

'সেখানে কী করতে?'

শাশ্বত বললে, 'একটা মীটিং ছিল।'

'কীসের মিটিং?'

শাশ্বত বললে, 'আর বলিসনি। সবাই আমাকে চাইবে। আমি একলা মানুষ, কত লোকের কথা ভাবব? দেখ না, নাটোরের মহারাজা ডেকে

পাঠিয়ে বললে বিলেত যাচ্ছে, একলা যেতে ভাল লাগছে না, তাই আমাকে বললে, 'তুই আমার সঙ্গে চল।'

'বিলেত যেতে বলছে তোকে ?'

'হ্যাঁ রে, কী ঝামেলা আমার বল দিকিনি! আমার নিজের মামা কতবার বিলেত যাবার জন্যে আমাকে বলছে, তাই-ই বলে আমি যেতে পারছি না, আর আমি ওই বুড়োর ফাই-ফরমাশ খাটতে বিলেত যাব ?'

আমি মনে-মনে শাশ্বত'র কথা শুনে হাসলাম। কিন্তু বাইরে তাকে কিছু বুঝতে দিলাম না। বললাম, 'নাটোরের মহারাজার সঙ্গে তোর আলাপ হল কবে ? কী করে ?'

শাশ্বত বললে, 'আরে নাটোরের মহারাজা তো আমার বাবার ফ্রেণ্ড, দু'জনে খুব ভাব ছিল এককালে। সেই ছোটবেলা থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। আমাকে খুব ভালবাসে মহারাজা! আমি তখন সবে খেতে বসেছি, এমন সময় মহারাজার ম্যানেজার এসে আমাকে ডাকলে। বললে, মহারাজা সাহেব আপনাকে ডেকেছে।'

'তারপর' ?

'তারপর এই সেখান থেকে তো আসছি।'

'তুই মহারাজকে কী বললি ?'

'আমি স্পষ্ট বলে এলুম, আমার এখন বিলেত যাবার সময় নেই।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম শাশ্বত'র কথা শুনে। নাটোরের মহারাজার সঙ্গে বিলেত যাবার এরকম সুযোগ পেয়েও শাশ্বত তা ছেড়ে দিলে!

বললাম, 'কেন তুই রাজি হলিনা ? কত দূর-দূর দেশে ঘুরতে পারতিস! অথচ একটা পয়সাও পকেট থেকে খরচ করতে হত না।'

শাশ্বত বললে, 'দূর, নিজের দেশটাই ভাল করে ঘুরে দেখতে পারলুম না, আর আমি যাব সাহেবদের দেশ দেখতে ? জানিস, আমাদের দেশে কত গরীব লোক আছে। তারা আধবেলা পেটপুরে খেতেই পায় না, তাদের এত কষ্ট। সেই গরীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে-ভেবেই রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। তাই তো আমি রাত্তিরে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।'

'কেন, রাত্তিরে রাস্তায় বেরিয়ে কী হয় ?'

শাশ্বত বললে, 'রাত্তিরেই তো মানুষের আসল রূপটা দেখা যায়! দিনেরবেলা তো সবাই কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু রাত্তিরে সবাই রাস্তায় ফুটপাতের ওপর যে-রকম ভাবে শুয়ে থাকে, তা দেখলে তোর চোখ ফেটে জল বেরোবে। সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।'

আমি নিজে কখনও রাত জেগে বেড়াতে বেরোইনি। আমার বাড়িতে রাত ন'টার পর বাইরে থাকলে বকুনি খেতে হয়। মায়ের নিয়ম ছিল বাড়ির সবাইকে রাত ন'টার ভেতরে সব কাজ সেরে বাড়িতে আসতেই হবে। আর ভোর ছ'টার মধ্যে সকলকে বিছানা ছেড়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে। এই নিয়ম যে না মানবে, সে সেদিন খেতে পাবে না। এই-ই ছিল শাস্তি। আমার দাদারাও এই নিয়ম বরাবর মেনে এসেছেন, বাবাও সেই নিয়ম মানতেন।

আমার এ নিয়ম ভাল লাগত না। মনে হতো আমি যেন বন্দী হয়ে আছি বাড়িতে। তাই হিংসে হত শাশ্বতকে দেখে। ভাবতুম ও কেমন স্বাধীন! মায়ের কথা শোনবার দায়-দায়িত্ব নেই ওর। শাশ্বত আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে, কী ভাবছিস ?'

বললাম, 'তোর ওপর আমার খুব হিংসে হচ্ছে।'

'কেন ?'

'তুই স্বাধীন। তোর যা ইচ্ছে তাই করতে পারিস। আমার বাড়িতে মা নিয়ম করে দিয়েছে, রাত ন'টার পর আর কেউ বাইরে থাকবে না। সবাইকে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।'

শাশ্বত বললে, 'মায়ের কথা শুনলে তো আমার চলবে না ভাই, আমাকে পরে অনেক বড়-বড় কাজ করতে হবে, এখন থেকে তাই তার ট্রেনিং নিচ্ছি। এই তো আমার বাড়িতে মায়ের জ্বর হয়েছে। মা রাঁধতেও পারছে না, তা বলে কি আমি দিন-রাত মায়ের পাশে বসে মায়ের সেবা করছি ?'

'তা'হলে রান্না করছে কে তোদের ?'

শাশ্বত বললে, 'কেউ না—'

'তা'হলে তুই কী খাচ্ছিস ?'

'আরে আমার খাওয়ার ভাবনা ? আমি যেখানে যাব, সেখানেই তারা আমাকে খাতির করে খাওয়াবে।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'কেন ?'

শাশ্বত বললে, 'আরে সবাই তো ভেতরে ভেতরে জানে, আমার মামা পুলিস কমিশনার। আমি যদি মামাকে একটু বলে দিই, অমনি মামা সকলকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে ফেলবে। এই তো আজ, নাটোরের মহারাজা আমাকে কত কী খাওয়ালে। চপ্, কাটলেট, পোলাও, মাছের কালিয়া। এত খেয়েছি যে নড়তে পারছি না। আর খাইয়ে-দাইয়ে যেই বলেছে মহারাজার সঙ্গে বিলেত যেতে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি, এত খাওয়ানোর মানেটা কী। বুঝলাম, নিজের স্বার্থেই আমাকে এত খাইয়েছে।'

আমি বুঝতে পারলুম, শাশ্বত'র সমস্ত কথা মিথ্যে। আমারই সঙ্গে মিথ্যে কথা বলতো বলে আমার বড় কষ্ট হতো শাশ্বত'র জন্যে। কিন্তু আমি ওকে এত ভালবাসতুম যে, ওর মুখের সামনে কিছু বলতে পারতুম না। অন্য সকলকে ছেড়ে ওর সঙ্গেই তাই মিশতুম।

রাস্তায় যেতে-যেতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে আসতেই বললুম, 'চল, দোকানে কিছু খেয়ে নিই। খাবি—'

আমি জানতুম, শাশ্বত'র মা তিনদিন জ্বরে পড়ে আছেন, রান্না করতে পারেননি, তাই শাশ্বত'রও খাওয়া হয়নি। উপোস করে আছে। অথচ লজ্জায় ছোট হবার ভয়ে সে-কথা মুখেও বলতে পারছে না।

শাশ্বত দোকানের সাইনবোর্ডটা একবার দেখে নিলে।

তারপর বললে, 'আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না। তোর যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে, তো তুই খা গিয়ে। আমি পাশে বসে থাকব।'

তারপর বললো, 'ছ্যাখ, তোরা এই সব বাজে রেস্টুরেন্ট খাস, এখানে যদি আমার মামা এই অবস্থায় আমাকে দেখেন, তো কী ভাববেন বল দিকিনি।'

'কী আর ভাববে?'

শাশ্বত বললে, আমার মামা এসব মোটে দেখতে পারেন না। আমাকে প্রায়ই মামা বলেন, 'যদি খেতে হয় তো চৌরঙ্গীর বড়-বড় সাহেবি হোটলে খাবি। এখানকার খাবার সব ভেজাল জিনিস দিয়ে তৈরী। ভেজাল ঘি, ভেজাল তেল, ভেজাল মাংস, ভেজাল পেচা মাছ। আর চৌরঙ্গীর সাহেবি হোটেলে সব খাঁটি জিনিস। আর তা-ছাড়া আমি তো ভাগ্নে হই, আমার লজ্জা, আমার অপমান মামারও অপমান কিনা।

রেস্টুরেণ্টে ঢুকে আমি অনেক কিছু খাবারের অর্ডার দিলুম। কাটলেট, চপ, ফিস্-ফ্রাই, টোস্ট, অমলেট অনেক কিছু।

শাশ্বত'র দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দু'টো চক্চক্ করছে। বুঝলাম, তিন দিন উপোস করে তার পেট তখন ক্ষিদের জ্বালায় চোঁ-চোঁ করছে। তবু লজ্জায় মুখে কিছু বলতে পারছে না সে। আমি এক-মনে এক-এক করে তাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খেতে লাগলাম। খানিক পরে তাকে বললাম, 'কা রে, খাবি? একটু চেখে দেখ না তুই, কী রকম রেঁধেছে এরা।'

শাশ্বত বললে, 'ভাই, এইসব জায়গায় আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ঘেন্না করে এসব ছোট হোটেলে খেতে। আর তা-ছাড়া নাটোরের মহারাজ আমাকে পেটভরে খাইয়ে দিয়েছে এক্ষুনি।'

আমি বললাম, 'তবু একটু চেখেই দেখ না।'

এতক্ষণে শাশ্বত বোধহয় আর লোভ সামলাতে পারলে না। বললে, 'আচ্ছা, তুই যখন বলছিস, তখন একটুখানি কেটে দে, চেখে দেখি, খুব সামান্য দিবি, বেশি যেন না হয়।'

আর একটা প্লেট আনতে বলে দিলাম বয়কে। প্লেট আসতেই আমি আধখানা ফিস্‌ফ্রাই তুলে দিলাম তার প্লেটে।

'এ কী করলি ? এ কী করলি ?, অত খানি দিলি কেন ?' বলে শাশ্বত চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললাম, 'দ্যাখ্ না খেয়ে। না খেতে ভাল লাগে ফেলে দে।'

শাশ্বত একবার খাবার আগে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল ভাল করে। তা দেখে আমি বললাম, 'রাস্তার দিকে চেয়ে কী দেখছিস ?'

শাশ্বত বললে, 'দেখছি কেউ আমাকে দেখে ফেলেছে কি না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আর দেখবে তোকে ?'

শাশ্বত বললে, 'কিছু বলা তো যায় না, হয়তো মামাই থাকতে পারেন বাইরে।'

আমি বললাম, 'দূর তোর মামা হলেন পুলিস-কমিশনার, তিনি কখনও এখানে থাকতে পারেন ? তাঁর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। এদিকে চেয়ে দেখতে তাঁর বয়ে গেছে।'

শাশ্বত বললে, 'তুই জানিস না, আমার মামাকে জানলে তুই আর এ কথা বলতিস না। মামা ছদ্মবেশে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কে কোথায় কী করছে, কে ঘুষ নিচ্ছে, কে চুরি করছে, সমস্ত মামার নখ-দর্পণে।'

বলে পাছে কেউ দেখতে পায় সেই ভয়ে, শাশ্বত কাঁটা-চামচ দিয়ে সেই আধখানা ফ্রাইটা একসঙ্গে মুখে পুরে একেবারে গিলে ফেলেছে।

বললাম, 'কী রে, কেমন লাগলো খেতে ?'

শাশ্বত, তখন সবটা খেয়ে ফেলেছে। বললে, 'বিশ্রী একেবারে বিশ্রী। তুই এত বিশ্রী ফিস্-ফ্রাই খাচ্ছিস কী করে, বুঝতে পারছি না। তুই যদি চৌরঙ্গীর সাহেবি হোটেলের ফিস্-ফ্রাই খেতিস, তো তা জীবনে ভুলতে পারতিস না। এ একেবারে ভেজাল জিনিস। আসলে এটা ভেট্‌কি-মাছের ফিস্-ফ্রাই নয়, তেলাপিয়া মাছের ফিস্-ফ্রাই। এ সম্বন্ধে তোর সঙ্গে বাজি লড়তে পারি। বাজী লড়বি ?'

আমি বললাম, 'কিন্তু এদের চিকেন কাটলেটটা ভাই সত্যিই ভাল, আসল চিকেন কাটলেট—'

শাশ্বত বললে, 'না বাবা, আর খাব না। গা বমি-বমি করছে।'

'তুই এক একটুখানি শুধু চেখে দেখ, আমার কথাটা রাখ তুই একবার।'

শাশ্বত বললে, 'না ভাই, আমি জেনে-শুনে বিষ খাব না-ভাই—'

আমি তার আপত্তি না শুনে তার প্লেটে পুরো একটা চিকেন কাটলেট তুলে দিলাম। শাশ্বত রেগে ফেটে পড়ে বললে 'কেন এটা দিলি তুই? জানিস এ-সব দোকানে আমি জীবনে খাই না।'

আমি বললাম, 'এটা খাঁটি জিনিস, এটাতে ভেজাল নেই, তুই একবার খেয়ে দেখ—'

শাশ্বত নিছক অনুরোধে পডে কাটলেটটা গপ্-গপ্ করে খেয়ে ফেলে রাস্তার দিকে আবার চেয়ে দেখলে। ছদ্মবেশী মামা কোথায়ও লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছেন কি না। বাইরের লোক চিনতে পারুক আর না-পারুক, শাশ্বত তার নিজের মামাকে তো চিনতে পারবেই।

বললাম, 'কীরকম খেলি? ভাল?'

'আরে দূর। এর নাম কি কাটলেট? এ তো কচ্ছপের মাংসের কাটলেট। আমি চিকেন কাটলেট জীবনে কখনও খাইনি ভেবেছিস? এর আগাগোড়া ভেজাল। আজকে বাড়িতে গিয়েই আবার একটা ওষুধ খেতে হবে।'

কিন্তু আশ্চর্য, 'খাব না' 'খাব না' করে শাশ্বত দুটো কাটলেট, দুটো বড়-বড় ফিস্-ফ্রাই, তিনটে চপ খেয়ে ফেললে। আমি যা খেলুম, শাশ্বত তার প্রায় ডবল খেলে। তারপর আমরা উঠলুম। আমি মানি-ব্যাগ বার করে খাবারের দাম দিয়ে দিলুম। শাশ্বত জিজ্ঞেস করলে 'কত দিলি?'

আমি বললাম, 'তেরো টাকা চার আনা।'

শাশ্বত বললে 'ভেজাল বলেই এত সস্তা হল। এই জিনিসই চৌরঙ্গীর সাহেবি হোটেলে হলে পঞ্চাশ টাকার বিল হত। তোর তেরো টাকা চার আনার বিষ খাওয়ার চেয়ে সে অনেক ভাল। তোকে বলে রাখছি, আর কক্ষনো এমন করে বিষ খেয়ে টাকা নষ্ট করিসনি।'

শাশ্বত'র কথা শুনে আমি হাসলুমও না, কাঁদলুমও না। আমি শুধু এই ভেবে মনে তৃপ্তি পেলুম যে আমি অভুক্ত, অহঙ্কারী, অভিমানী মানুষটাকে পেট ভরে খাওয়াতে পেরেছি। যে মুখ ফুটে কখনও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না, বরং মিথ্যে আত্মগর্বে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে যাবে, তাকে কৃপা করা, করুণা করাও তো এক ধরনের আনন্দ। সেই আনন্দই হত আমার শাশ্বত'র সঙ্গে মিশে।

* * *

সেদিন স্কুলে গিয়ে দেখি শাশ্বত আসেনি। রোলকলের সময় তার নামও

ডাকা হল না। মাস্টারমশাইকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'স্যার, শাশ্বত'র নাম ডাকলেন না?'

স্যার ভাল করে রোল-কলের খাতাটা আবার দেখলেন। বললেন, শাশ্বত'র নাম কাটা গেছে।'

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কাটা গেল কেন স্যার?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এ খাতায় তো কিছু লেখা নেই, বোধহয় মাইনে দেয়নি—'

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। ক্লাসের শেষে স্কুলের অফিসে গিয়ে জানলাম, শাশ্বত'র ছ' মাসের মাইনে বাকি!

ছ'মাস মাইনে দেয়নি শাশ্বত! চার টাকা করে মাস-মাইনে, তাও দেয়নি সে। বোধহয় আগেই শাশ্বত জানতে পেরেছিল যে, তার নাম কাটা গেছে তাই আর সেদিন স্কুলে আসেনি। স্কুল থেকে ফেরার পথে আর বাড়ি গেলাম না। সোজা শাশ্বতদের বস্তি-বাড়িতে গেলাম। তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সদর দরজায় তালা-চাবি বন্ধ। বুঝলাম, শাশ্বত'র মা নিশ্চয় নাজিরদের বাড়ি সেই চাকরিটা করতে গেছেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। কিন্তু মাসিমা কি শাশ্বত, কারোরই দেখা পেলাম না। আস্তে-আস্তে নিজের বাড়ি চলে এলাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী-রে স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী হল যে? সেই বখাটে ছোঁড়াটার বাড়িতে গেছলি বুঝি?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলাম। বড় কান্না পাচ্ছিল শাশ্বত'র কথা ভেবে। কেন সে অমন মিথ্যেবাদী হল? কেন সে আমাকে তার দুঃখের কষ্টের কথা বলে না? তার মা যে পয়সার জন্যে পরের বাড়ি ঝি গিরি করেন, তা বলতে লজ্জা করে কেন? নিজের দারিদ্র্যের কথা অন্যের কাছে না বলুক, আমার কাছে বলতে তার দোষ কী? আমি তো তাকে ভালবাসি। তার চরিত্রের অত দোষ থাকতেও আমি তো তাকে কোনও দিন কিছু বলিনি। আমি তো তাদের বাড়িওয়ালার বাকি ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের জামা-প্যান্ট তার মায়ের হাতে দিয়ে এসেছি, যাতে সে ভাল জামা প্যান্ট পরতে পারে। এ তার কী-রকম স্বভাব! তাহ'লে সে যে বলেছে, তার মামা পুলিশ কমিশনার, সেটাও কি মিথ্যে?

বিকেলবেলায় স্কুল থেকে ফিরে আমার জল-খাবারের ব্যবস্থা থাকে। সেদিন খেতে গিয়ে আমার যেন গলায় সব আটকে গেল। আমি যেন আর কিছুতেই খেতে পারলুম না। ভাবলুম, আমি, এত পেট ভরে খাচ্ছি, আর

শাশ্বত আমার বয়েসী হয়েও কিছু খেতে পাচ্ছে না। তবু লজ্জায় সে কারও মাথা নীচু করবে না। এ তার কী অদ্ভুত উদ্ধত স্বভাব! আমাকে তো সব মন খুলে বলতে পারতো! কেন বললে না আমাকে?

আমি চুপি-চুপি বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, আমাকে বলবে কিছু।'

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, 'আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে, দেবে?'

'টাকা?' বাবা চমকে উঠলেন। বাবার কাছে কখনও এমন করে টাকা চাইনি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা কী করবে তুমি?'

বললাম, 'দরকার আছে।'

'তা মায়ের কাছে গিয়ে টাকা চাও না—'

বললাম, 'না, মা টাকা দেবে না, তুমি টাকা দাও—'

'কত টাকা?'

বললাম, 'চব্বিশ টাকা।'

'চব্বিশ টাকা শুনে একটু অবাকও হলেন, বিরক্তও হলেন। তারপর বললেন, 'চব্বিশ টাকা নিয়ে কী করবে?'

বললাম, 'আমাদের স্কুলের একটা ছেলের ছ'মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। তাই তার ক্লাস থেকে নাম কাটা গেছে। চব্বিশটা টাকা না দিলে, তার খাতায় নাম উঠবে না।'

আমি বাড়ির আদুরে ছেলে। আমার পীড়াপীড়িতে বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। আমাকে চব্বিশটা টাকা দিয়ে দিলেন।

টাকাটা হাতে নিয়ে আমি বাবাকে বললাম, 'এই টাকার কথা যেন মা'কে বলো না বাবা তুমি।'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা বলবো না—'

টাকাটা নেবার পরই শাশ্বতদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন বাড়িতে মাস্টারমশাই এসে গেছেন, তাই আর যাওয়া হলো না। আমি মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসে গেলাম। পরদিন সকালেও যাওয়া হলো না। ক্লাসের পড়া সেরে হাতে আর সময় ছিল না। একেবারে ভাত খেয়ে স্কুলে চলে গেলাম। একটু আগে-আগেই গেলাম। গিয়ে সোজা চলে গেলাম হেড-ক্লার্কের অফিসে। বললাম, 'স্যার, আমি মাইনে দিতে এসেছি—'

হেড-ক্লার্ক মশাই আমাকে অনেক দিন আগে থেকেই চিনতেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'মাইনে ?'

বলে খাতাটা বার করলেন। বললেন, 'কোন মাসের মাইনে ? তোমার তো সব মাসের মাইনেই দেওয়া আছে—'

বললাম, 'আমার না স্যার, শাশ্বত'র ছ'মাসের মাইনে দেওয়া বাকি পড়েছে বলে তার নাম কাটা গেছে। সেই ছ' মাসের মাইনেটা আমি দিতে এসেছি—'

'কেন ? শাশ্বত'র মাইনে তুমি দিতে এসেছ কেন ? সে কোথায় ?'

আমি আর কী বলব ? বললাম, 'সে কোথায় জানি না।'

বলে রসিদটা নিয়ে আমি ক্লাসে চলে গেলাম। মনে খুব আনন্দ হল। আবার শাশ্বত ক্লাসে আসতে পারবে, আবার তার সঙ্গে আমার রোজ দেখা হবে। আবার দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে পারবো।

হেড-ক্লার্ক মশাই বুঝলেন কি বুঝলেন না, জানি না। হয়তো মনে-মনে একটা কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলেন যে, শাশ্বত'র মাইনেটা আমি দিলাম কেন ?

পৃথিবীতে একজন মানুষ যে আর-একজন মানুষের জন্যে এমন উপকার করতে পারে, এটা আজকালকার যুগে হয়তো কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু সেই যুগে আমার মনে হত আমি শাশ্বত'র জন্যে বোধহয় সব কিছু করতে পারি। এমন-কী দরকার হলে প্রাণও দিতে পারি। স্কুলের পর আমি ঠিক করলাম, বাড়িতে আগে না গিয়ে আগে শাশ্বতকে গিয়ে খবরটা দেব। তাই শাশ্বত'র বাড়ির দিকেই পা বাড়ালাম।

কিন্তু শাশ্বত'র বাড়িতে যাবার আগেই যে সেখানে আর এক নাটকের অভিনয় হতে শুরু করেছে, তা আমি জানতাম না তখনও।

দুপুরবেলা মাসিমা ঘরের ভেতরে নিজের তক্তপোষের ওপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। একটাই তো মাত্র ঘর। সেই ঘরে শাশ্বত শুতো তক্তপোষের ওপর, আর মাসিমা শুতেন মেঝের ওপর বিছানা পেতে। আর কল্ হোক পায়খানা হোক্, সব এজমালি। অর্থাৎ বস্তির যত ভাড়াটে, তাদের সকলের জন্যে ওই একটাই কল-পায়খানা। তারই ভাড়া মাসে দশ টাকা। সেই দশটা করে টাকাও মাসে দিতে পারত না শাশ্বতরা।

আমার বড় দুঃখ হতো শাশ্বত'র জন্যে। মানুষ বিপদে পড়লে একটু হতাশ হয়ে পড়ে। তখন কেউ বা ঠাকুর-দেবতার আশ্রয় নেয়, আর কেউ বা পরের কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে, কিংবা হালকা হবার

চেষ্টা করে। কিন্তু শাশ্বত ছিল উলটো প্রকৃতির। মনে হতো সে যেন অন্য পৃথিবীর লোক। শোক-কষ্ট-বিপদ যেন তাকে স্পর্শ করতে পারতো না।

যত তার বিপদ আসত, ততোই সে আরও মিথ্যেবাদী হয়ে উঠতো।

ততোই যেন সে আরও বুক ফুলিয়ে বেড়াত। আমি যে তার এত বড় হিতাকাঙ্খী, সেই আমার কাছেও তার মনের কথা প্রকাশ করত না। আমাকেও সে অবিশ্বাস করে নিজেকে প্রবঞ্চনা করত। আমার তাই কেবল মনে হতো হয়তো সে নিজেকেও বিশ্বাস করে না।

এ-রকম চরিত্র আমি অন্ততঃ জীবনে একটাও দেখিনি। কিংবা কোনও গল্প-উপন্যাসেও আমি এমন চরিত্র পড়িনি।

এতদিন পরে সেই শাশ্বতকে আমার অফিসে দেখে আমার সেই সব দিনকার সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগল। কত ছেলের সঙ্গেই তো ছেলেবেলায় একসঙ্গে একই ক্লাসে বছরের পর বছর পড়েছি। কেউ পরবর্তী কালে বড় হয়েছে, নাম করেছে, আবার কেউ বা বেশী কিছু না করতে পারুক, কোনোরকমে একটা ছোট-খাটো অফিসে একটা ছোট-খাটো চাকরি নিয়ে টিঁকে আছে।

কিন্তু শাশ্বত? সেই শাশ্বত, যাকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসতুম, যার বিপদের দিনে আমি আমার সাধ্যের অতীত সাহায্য করতে চেষ্টা করতুম, সে যে একদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, তার কোনও খোঁজ পাইনি। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি শাশ্বত'র কথা।

সতীশ বলে একজন আমাদের ক্লাসের ভাল ছেলে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলেছিল, 'সেই চালবাজ শাশ্বত'র কথা বলছিস? সে-তো তোরই বন্ধু ছিল, তার সঙ্গে তো তোরই বেশি মাখামাখি, বেশি ভাব ছিল। তার কথা তুই আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

আমি বলেছিলাম, 'চালবাজ সে তা আমিও জানতুম, তা-বলে সে কি মানুষ নয়? সে-যে গরীব, সে যে চালবাজ, তার জন্যে কি সে দায়ী?'

সতীশ বলেছিল, 'সে দায়ী নয় তো কে দায়ী?'

মনে আছে, আমি তার জবাবে বলেছিলাম, 'সংসারে সব মানুষই যে বড়লোকের ঘরে জন্মাবে, তার তো কোনও মানে নেই। অনেকে তো গরীবের ঘরেও জন্মায়।'

সতীশ বলেছিল, 'সে যদি গরীব তো গরীবের মতোই তার থাকা উচিত,

কেন সে গরীব হয়েও অমন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতো ? কেন সে কথায়-কথায় রাজা-উজির মারতো ?'

আমি বলেছিলাম, 'তোদের অত অহঙ্কার ভাল নয় সতীশ। তুই যদি গরীব বিধবা মায়ের ছেলে হতিস, আর বস্তি-বাড়িতে একখানা দশ টাকা ভাড়ার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতিস্, তা'হলে তার মনের দুঃখটা বুঝতিস্। দুঃখ-কষ্টে কেউ মাথা হেঁট করে, আবার কেউ বা দুঃখে-আঘাতে ঘা খেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যায়। আবার কেউ বা আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে চালিয়াত হয়ে ওঠে। শাশ্বত'র তাই-ই হয়েছিল। সে মাথা হেঁট করতে পারেনি, সন্ন্যাসীও হতে পারেনি, তাই চালবাজ হয়ে উঠেছিল। এটা তার দোষ নয়, দোষ আমাদের, যারা এই বর্তমান সমাজের লোক।'

পরবর্তী কালের এ-সব কথা এখন থাক। আগে সেই আগেকার কথাগুলো বলি।

সেদিন মাসিমা দুপুরবেলা শাশ্বত'র তক্তপোষের ওপর শুয়ে একটু আরাম করছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'চারুবালা দাসী—চারুবালা দাসী—'

সঙ্গে-সঙ্গে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে লাগল খটাখট্, খটা খট্ শব্দ করে। মাসিমার ঘুম ভেঙে গেছে। বললেন, 'কে ?'

বাইরে থেকে তেমনি হেঁড়ে গলায় জবাব এল, 'আমি কোর্ট থেকে আসছি, শমন আছে—'

মাসিমা কথাগুলোর মানে কিছু বুঝতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। খুলে দিতেই দেখলেন, একজন যণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই বাবা তোমার ? কাকে চাই ?'

লোকটা বললে, 'আমি পেয়াদা, আদালত থেকে আসছি শমন ধরাতে। চারুবালা দাসী কার নাম ?'

মাসিমা বললেন, 'আমার নাম বাবা—আমিই তো চারুবালা দাসী—'

লোকটা একটা কাগজ মাসিমার হাতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই শমনটা নাও, এখানে একটা সই করে দাও—'

'সই ?'

মাসিমা সই করতে জানেন না। বললেন, 'আমি তো নাম সই করতে জানি

না বাবা। আমি লেখা-পড়া জানিনে। আমার ছেলে বাড়িতে নেই, সে বাড়ি আসুক, তখন সই করে নেব, কাগজটা তুমি রেখে যাও বাবা—'

লোকটা বললে, 'আমার দাঁড়াবার সময় নেই, সই না দিলে আমি শমনটা দরজায় লটকে দিয়ে যাব—'

মাসিমা বললেন, 'আমার ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে না বাবা?'

লোকটা বললে, 'তাহ'লে দু'টো টাকা লাগবে। দু'টো টাকা দিলে আমি দু'দিন পরে আসব—'

মাসিমা বললেন, 'আমি গরীব মানুষ, আমি দু'টো টাকা কোথায় পাব বাবা এখন? আমার হাতে তো এখন একটা কানা-কড়িও নেই—'

লোকটা বললে, 'তা'হলে একটা টাকাই না-হয় দিন, আমি শমনটা না-হয় দু'দিন ঝুলিয়ে রাখব!'

মাসিমা বললেন, 'একটা টাকাই যদি থাকবে, তো আমি কি তা'হলে তোমাকে দিতুম না বলতে চাও? আমি তো পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তাতেই আমার আর আমার ছেলে দু'জনের পেট চলে। এখন তো মাসের শেষ, তারপরে আমার ছেলের ইস্কুলের মাইনে ছ'মাস বাকি পড়ে গেছে ইস্কুলের খাতা থেকে। আমি বড় গরীব লোক বাবা—'

কিন্তু কোর্টের পেয়াদা যদি মায়া-দয়া-দাক্ষিণ্যই থাকবে, তা'হলে সে কোর্টের পেয়াদা হয়েছে কেন? কোর্ট যে পাথর-পাষাণ, দয়া-মায়া-হীন জড়-সড় বস্তু, তা চারুবালা দাসী জানতেন না, তাই অত অনুনয়-বিনয় করতে আরম্ভ করছিলেন। বলেছিলেন, 'গরীব মানুষকে একটু দয়া করে না বাবা?'

লোকটা বলছিল, 'টাকা পেলে তবে আমরা মায়া-দয়া করি মা। আমরা কোর্টের পেয়াদা, আমরা টাকাকেই কেবল চিনি, দয়া-মায়াকে চিনি না। টাকা না পেলে আমরা এ-শমন দরজায় লট্‌কে দিয়ে যাব। তখন এ-বাড়ি থেকে কোর্টের লোক পুলিশ এনে আপনাদের ভাগিয়ে দেবে। তারা আপনার মাল-পত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

লোকটার সঙ্গে মাসিমার এই সব কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আমি সেখানে গিযে একটা অচেনা লোককে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি কে?'

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, 'এই শমনটা সই না করলে আমি দরজায় এটা লটকে দিয়ে যাব, তা'হলে আমার ডিউটি শেষ।'

বললাম, ‘ কিন্তু মাসিমা যে লেখা-পড়া জানেন না, সই করবেন কী করে ? শাশ্বত এলে সে সই করে নেবে'খন—’

লোকটা বললে, ‘তাহ'লে ছু'টো টাকা দিতে হবে।’

‘কেন ?’

লোকটা বললে, ‘আমাকে তো নিজের ডিউটি করতে হলে। আমি কোর্টে গিয়ে বলবো, আসামীকে বাড়িতে পাইনি !’

বললাম, ‘আমার কাছে একটা টাকা আছে, তাতে যদি হয় তো আপনি বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি—’

লোকটা বললে, ‘তাই-ই দাও—’

আমি পকেট থেকে একটা টাকা পেয়াদার হাতে দিলাম। লোকটা খুশি মনে হাসতে-হাসতে চলে গেল। যাবার সময় মাসিমাকে বলে গেল, ‘এ বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিলাম না, কিন্তু বেশিদিন তো আমি আটকে রাখতে পারব না। কাল হোক, পরশু হোক, এ-শমন আমাকে জারি করতেই হবে। বাড়িওয়ালা আপনার নামে বাড়ি থেকে উৎখাত করবার মামলা এনেছে, একজন উকিলের ব্যবস্থা করে ফেলুন তাড়াতাড়ি—’ বলে লোকটা টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল।

মাসিমা আমার দিকে চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে-পড়তে বললেন, ‘আমাদের কী হবে বাবা ? বাড়ি ছাড়লে আমরা কোথায় যাব ?’

আমি মাসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ‘আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা, আমি সব ঠিক করে দেব। আজ আমি শাশ্বত'র স্কুলের ছ'মাসের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিয়েছি। খাতায় আবার তার নাম উঠবে। তাকে কাল আবার ইস্কুলে যেতে বলবেন।’

মাসিমার চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বললেন, ‘তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করবো বাবা জানি না, আর জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার ছেলে ছিলে। নিজের পেটের ছেলেও এমন করে কারও জন্যে কিছু করে না। এখন এদিকে বাড়ির কী হবে বলো ? ও লোকটা তো বলে গেল আবার কাল-পরশু আসবে, এসে আবার জ্বালাবে আমাকে, তখন কে আবার আমাকে বাঁচাবে ?’

আমি বললাম, ‘আপনি কিছু ভাববেন না, আমার বাবা মস্ত বড় উকিল। আমার বাবা সব কিছু ঠিক করে দেবে। আমার বাবার কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। কী করতে হবে, তা বাবাই আপনাকে সব বলে দেবেন।’

মাসিমা বললেন, 'কিন্তু আমি তো বাবা মেয়েমানুষ, কোর্ট-ঘর করতে পারব না।'

আমি বললাম, 'সে শাশ্বত করবে—'

মাসিমা বললেন, 'হা ভগবান, তার ভরসাতে থাকলেই হয়েছে! সে ততক্ষণ রাজা-উজির মেরে বেড়াবে।'

আমি বললাম, 'সে-সব কথা পরে হবে, আপনি আগে আমার বাবার কাছে চলুন তো, বাবা যা বলবে তাই-ই হবে।'

তখন বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছিল। তখন মাসিমার নাজির-দের বাড়ি যাবার তাড়া। মাসিমা বললেন, 'তাহ'লে আমি আমার চাকরিটা আগে সেরে আসি, তারপর তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেও—'

তাই-ই ঠিক হল। আমি মাসিমাকে রেখে আমাদের বাড়ি চলে গেলাম।

বাড়ীতে আসতে মা বললেন, 'কী রে, ইস্কুল থেকে আসতে আজ এত দেরি কেন রে তোর?'

বললাম, 'একটা কাজ পড়েছিল—'

মা বললেন, 'তোর আবার কাজ কী? তুই তো কাজ করে একেবারে উল্‌টে যাচ্ছস।'

আমি আর সে-কথার কোনও জবাব দিলাম না। বাবা বাড়ি আসতেই আমি আবার শাশ্বতদের বাড়ি চলে গেলাম। তখন দেখি, মাসিমা নাজিরদের বাড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরছেন।

বললাম, 'চলুন মাসিমা, এবার বাবা বাইরের ঘরে গিয়ে বসবেন, কোনও লোক আসবার আগেই আপনার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব।'

মাসিমা তৈরি হয়েই ছিলেন। মাসিমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

বাবা তখন সবে জল-টল খেয়ে নিজের বৈঠকখানার ঘরে এসে বসেছেন।

আমি গিয়ে সোজা বাবাকে বললাম, 'বাবা, এই আমার বন্ধুর মা'কে সঙ্গে করে এনেছি—'

বাবা তো অবাক! মাসিমা তার আগেই একেবারে বাবার পায়ে হাত ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়েছেন। বাবা তো অতর্কিত আক্রমণে একেবারে চমকে উঠে উঠলেন, 'থাক-থাক, কী হয়েছে মা—'

আমি মাসিমার হয়ে বললাম, 'মাসিমা বড় বিপদে পড়েছেন বাবা, এঁকে তোমাকে বাঁচাতেই হবে!'

বাবা আমার দিকে চাইলেন। বললেন, 'মাসিমা মানে?'

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড শাশ্বত'র মা। বড় বিপদে

পড়েছেন। বাড়িওয়ালা এর নামে মামলা করেছে, বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে।'

বাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই ভাড়া বাকি পড়েছে। নইলে বাড়িওয়ালা মামলা করবে কেন ? তা কত মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে ?'

বললাম, 'প্রায় আট মাসের মতন।'

বাবা বললেন, 'তাহ'লে তো বাড়িওয়ালা মামলা করবেই—'

আমি বললাম, 'মামলা করেছে, কিন্তু এখনও কিছু হয়নি। শুধু একজন বেলিফ্ এসেছিল, সে শমন দিতে চাইছিল, তাকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।'

বাবা খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন 'তা আপনারা অন্য বাড়িতে চলে যান না। এখন কত টাকা ভাড়া আপনাদের ?'

মসিমা বললেন, 'দশ টাকা !'

'তাহ'লে সে বস্তি-বাড়ি ! তাই বলো। এখন কি আর ওই ভাড়াতে ঘর পাবেন ? এখন তো ওই ভাড়ায় আর এক ফালি বারান্দাও পাবেন না। তা দশ টাকা মাত্র ভাড়া, তাও নিয়ম করে দিতে পারেন না ? জানেন আজকাল তিন মাস ভাড়া বাকি পড়লেই ভাড়াটেকে উৎখাত হয়ে যেতে হয়।'

মাসিমা বললেন, 'দশ টাকা মাসে যদি দিতেই পারতুম, তাহ'লে কি আজ আমার এই দুর্ভোগ হতো ?'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার আর কে আছে ?'

মাসিমা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই আপনার ছেলের বয়সী এক ছেলে আমার, তা-ছাড়া আর কেউ নেই। আমি বিধবা মানুষ, পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে কুড়ি টাকা করে পাই। আর কোনও আয় নেই আমার !'

বাবা বলেন, 'তা আপনি বাকি ভাড়া সমস্ত একসঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারবেন ?'

মাসিমা বললেন, 'না, তা পারব না।'

বাবা বললেন, 'তাহ'লে আমি আর কী করতে পারি। আপনাকে ও-বাড়ি শেষে ছেড়ে দিতেই হবে। আমি কিছু করতে পারব না—'

মাসিমার চোখ দু'টো কান্নায় ভারী হয়ে এল। আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বাবাকে বললাম, 'মাসিমার জন্যে কিছু করতেই হবে বাবা।'

বাবা বললেন, 'আমি উকিল বলে কি আইনের কর্তা ? আইনে যা আছে, জজ তো তাই-ই করবে।'

আমি বললাম, 'তুমি যদি কিছু না করতে পারলে, তাহ'লে গরীব লোকদের কী হবে ?'

বাবা বললেন, 'আইন বড়লোক-গরীবলোক মানে না। যা ন্যায্য তাই-ই করবে।'

আমি বললাম, 'তাহ'লে গরীবদের কী হবে? তার কি চিরকালই পথেই বসে থাকবে?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, পথে বসা ছাড়া আর উপায় কী? রাস্তায় কত হাজার-হাজার লোক তো পথেই বসে-বসে সংসার করে, দেখিসনি?'

আমি বললাম, 'তা ওরা যে গরীব, তার জন্যে কি ওরা দায়ী?'

বাবা বললেন, 'ওরা দায়ী নয় তো কে দায়ী?'

আমি বললাম, 'কেন, আমরা দায়ী। আমরাই তো ওদের গরীব করে রেখেছি?'

বাবা এবার খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'খুব বড়-বড় কথা বলতে শিখেছিস তো। এসব কথা কোথায় শিখেছিস্ তুই?'

বললাম, 'বইয়ে পড়েছি।'

বাবা যেন অবাক হয়ে গেলেন আমার কথা শুনে। বললেন, 'বইতে পড়েছিস? কোন বইতে পড়েছিস? যে বইতে এ-সব কথা লেখা থাকে, সে-বই ছিঁড়ে ফেলে দে। আজকাল এই সব বই স্কুলে পড়ায় নাকি? কই দেখি, সে-বই নিয়ে আয় তো আমার কাছে।'

আমি বললাম, 'স্কুলের বই নয়, বাইরের বই থেকে পড়েছি—'

বাবা বললেন, 'যে-সব বইতে ও-সব কথা থাকে, সে-সব বই আর এখন থেকে পড়িস্ না। মানুষ গরীব হয় নিজের দোষে। কেউ কাউকে গরীব করে না। যারা পরিশ্রম করে না, মানুষকে ঠকায়, তারাই গরীব হয়।'

আমি প্রতিবাদ করলাম। বাবাকে বললাম, 'না, আমি বলছি তা ঠিক নয়। যারা পরকে ঠকায়, তারাই এই দেশে বড়লোক হয়।'

বাবা বললেন, 'তা আমিও কি গরীবদের ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছি?'

আমি বললাম 'তুমি খুনের আসামীকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে মোটা টাকা নাওনি? যে তোমাকে মোটা টাকা দিয়েছে, তুমি তার পক্ষ নাওনি? গরীবদের কখনও তুমি বাঁচিয়েছ? গরীবদের কথা একবারও তুমি ভেবেছ?'

বাবা চীৎকার করে উঠলেন, 'চুপ কর। বড় ল্যাঠা হয়েছিস তো তুই। বড়দের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও জানিস না?'

তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে বাবা বললেন, 'যান্ মা, আপনি এখন যান্। আমি আপনার জন্যে কিছু করতে পারবো না।'

মাসিমা চলে যাচ্ছিলেন। আমি থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি

যাবেন না মাসিমা। আপনার জন্যে যদি বাবা কিছু না করেন, তো আমিও এ-বাড়িতে আর থাকব না। আমিও এ-বাড়ি থেকে চলে যাব।'

বাবা বললেন, 'না-মা, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার ছেলের কথা আপনি শুনবেন না। আপনার মামলা আমি করতে পারতুম, কিন্তু আপনি যে ভাড়া বাকি ফেলেছেন, এর ওপর আমি বা কী করতে পারি, আর জজসাহেবেই বা কী করতে পারে? কারোর বাবার সাধ্যি নেই এ-ব্যাপারে আপনার কিছু উপকার করতে পারে!'

মাসিমার চোখের জল ফেলতে-ফেলতে চলে যাচ্ছিলেন, আমিও মাসিমার সঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা বাধা দিলেন। চেয়ার থেকে উঠে আমার হাতটা ধরে বললেন, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

আমি বললাম, 'আমি আর এ-বাড়িতে থাকব না—'

বাবা বললেন, 'কেন ওরা তোর কে?'

বললাম, 'মাসিমার ছেলে শাশ্বত আমার বন্ধু, আর কেউ নয়।'

বাবা বললেন, 'তা ওদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তোর কী ক্ষতি?'

আমি বললাম, 'ওরা রাস্তায় ভিক্ষে করবে, আর আমাকে তাই দেখতে হবে? সে আমি দেখতে পারব না। শাশ্বত যে আমার প্রাণের বন্ধু।'

বাবা বললেন, 'যত বাজে ছেলের সঙ্গে কেন তোর বন্ধুত্ব? ভাল ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারিস না?'

আমি বললাম, 'শাশ্বত গরীব হতে পারে, কিন্তু ভাল ছেলে!'

'পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তোর বন্ধু?'

বললাম, 'না—'

'তাহ'লে?'

বললাম, 'পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াকে আমি বড় গুণ মনে করি না। আমাদের পাড়ায় ইস্কুল থেকে অনেক ছেলেই তো ফার্স্ট হয়েছে, তারপর তারা রাস্তার ধারে বসে-বসে আড্ডা দেয়, বিড়ি খায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক'টা পরীক্ষায় পাস করেছিলেন?'

'তুই যে খুব বড়-বড় কথা শিখেছিস্।'

বাবা আমাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। মা তখন সংসারের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন। মায়ের সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখছো, তোমার ছেলে কী বলছে?'

ওই অসময়ে বাবাকে বাড়ির ভেতরে আসতে দেখে মা অবাক। বললেন, 'কী বলছে?'

বাবা বললেন, 'বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি লেখা-পড়া শেখেনি, তবু কত বড়লোক হয়েছে।'

মা আরও অবাক। বললেন, 'তা যা-ইচ্ছে বলুক না, তোমার কী? তুমি কাজ করতে-করতে আবার বাড়ীর ভেতর উঠে এলে কেন?'

বাবা বললেন, 'আমি কি সাধে উঠে এসেছি। তোমার ছেলের যা কাণ্ড! কোথা থেকে কোন এক বুড়ীকে ধরে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। বলে কিনা আমাকে বিনা পয়সায় তার মামলা করে দিতে হবে!'

মা কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'বুড়ী? কে বুড়ী? কিসের মামলা?'

বাবা বললেন, 'সে-কথা তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করো না—'

মা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কে রে? কোন বুড়ী? কী মামলা?'

আমি বললাম, 'শাশ্বত'র মা। মাসিমা বড় বিপদে পড়েছেন। বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেননি বলে তাঁর বাড়িওয়ালা মামলার নোটিস দিয়েছে!'

মা বললেন, 'তা তাদের মামলা, তাতে তোর কী? তোর নামে তো কেউ মামলা করেনি!'

আমি বললাম, 'বা-রে, আমার নামে মামলা না করলেই বা, কিন্তু বাড়িওয়ালা যদি ওদের নামে মামলা করে ওদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়, তখন কোথায় যাবে শাশ্বত'রা!'

মা বললেন, 'ওই এক শাশ্বত হয়েছে। একটা বখাটে ছেলে বন্ধু হয়েছে তোর। তার যা হয় হোক, তাতে তোর কী? তারা রাস্তায় বসুক আর জাহান্নামেই যাক, তা নিয়ে তোর মাথা-ব্যাথা কেন?'

বাবা বললেন, 'আবার শুনেছ ওর কথা? বলে কিনা আমি ওদের মামলার ভার না নিলে ও বাড়ি থেকে চলে যাবে! আমি তাই তোমার কাছে ধরে আনলুম। তুমি ওকে ঘরের দরজায় তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিও তো! আমার কোর্টের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আমি যাই—'

বলে বাবা চলে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে।

মা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনলি তো? এখন যদি ঘরের ভেতরে বন্ধ করে রাখি, তখন? তখন কী হবে?'

আমি বললাম, 'কতদিন আমাকে বন্ধ করে রাখবে তোমরা? যেদিন দরজা খুলবে, সেইদিনই আমি শাশ্বতদের বাড়িতে চলে যাব, আর তোমাদের কাছে আসব না—'

'তবে রে!' বলে মা আমাকে একটা ঘরের ভেতরে পুরে দরজায় শেকল

লাগিয়ে দিলেন। আর আমিও গুম্ হয়ে সেখানে বসে রইলুম।

অনেক রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেই বাবা মাস্টারমশাইকে বললেন, 'আপনি কী-রকম মাস্টারমশাই হয়েছেন? কী-রকম শিক্ষা দিচ্ছেন আমার ছেলেকে, আমার মুখের ওপর কথা বলে!'

বলে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললেন। মাস্টারমশাই সবই শুনলেন। কিন্তু তিনি কি বলবেন? বললেন, 'তাহ'লে আজকে আর পড়াব না?'

বাবা বললেন, 'পড়ান, কিন্তু ঘরের ভেতরে বসে। ওকে আমি আর ক'দিন স্কুলে যেতে দেব না। দেখি, ও-কী করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়! আমি স্কুলের হেড-মাস্টারকেও একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি!'

মাস্টারমশাইকে সেদিন আর বাইরের ঘরে পড়ালেন না। ও-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু নিয়ম-মাফিক পড়িয়ে গেলেন।

আমিও কিছু বললুম না। আমারও খুব জেদ। আমি ভাঙব, তবু মচ্‌কাব না। দাদারা অফিস থেকে এলেন। মায়ের কাছ থেকেই সমস্তই তাঁরা শুনলেন। বাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁদেরও কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

মা খেতে ডাকতে এলেন। আমি বললাম, 'আমি খাব না—'

বাবার কানে গিয়ে উঠল। বাবা সব শুনে বললেন, 'ও না-খায় না-খাবে, অমন ছেলের উপোস করাই ভাল।'

মা আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। আমাদের বড়িতে বাবার হুকমই শেষ কথা। বাবা শুধু জানলা দিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে খাবি না কেন?'

আমি বাবার কথার কোনও জবাব দিলাম না। বাবা অগত্যা নিজে খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর মা চুপি-চুপি আমার জানালার কাছে এলেন।

গলা নীচু করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, খাবি?'

আমি বললাম, 'না, কিছুতেই খাব না।'

মা আবার বললেন, 'কেউ জানতে পারবে না, চুপিচুপি খেয়ে নে, আমি ভেতরে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নে। কাউকে কিছু বলব না। না খেলে শরীর খারাপ হবে, তোর অসুখ করবে। খেয়ে নে।'

আমি বললুম, 'না আমি কিছুতেই খাব না'

সত্যিই আমি সেদিন কিছুতেই খেলাম না। ক্রমে চাকর-বাকর-ঠাকুর-ঝি সবাই খেয়ে নিলে। বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। চারাদিকে সমস্ত চুপচাপ। রাত্রের অন্ধকারে আমি এক-একা সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে রইলাম। শাশ্বত

আর মাসিমার কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, বাবা যদি মাসিমার মামলা না করেন, তাহ'লে আমি সুযোগ পেলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। আর কখনও এই বাড়িতে আসব না। বাবা-মা-দাদা কারোই মুখদর্শন করব না। বাড়ির সবাই আমার শত্রু। কেউ আমাকে ভালবাসে না এ-বাড়িতে।

হঠাৎ জানলার দিকে একটা ঠুক-ঠুক করে আস্তে শব্দ হল।

'কে ? কে টোকা দিচ্ছে ওখানে ?'

টক্ করে জানালাটা খুলেই দেখি বাইরে ঘুরগুট্টি অন্ধকার।

'কী রে বিনু, কী করছিস ?

শাশ্বত'র গলা। তখন চিনতে পারলাম। শাশ্বত কী করে জানলে যে আমাকে বাবা ঘরে চাবি-তালা দিয়ে বন্দী করে রেখেছেন ? কী করে জানলে আমি না খেয়ে উপোস করে আছি ?

বললাম, 'তুই কী করে জানলি রে যে আমি কিছু খাইনি ? কী করে জানতে পারলি যে, আমাকে বাবা ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়ে গেছেন ?'

শাশ্বত বললে, 'মা'র কাছে শুনলুম।'

'মাসিমা বলেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

শাশ্বত বললে, 'কেন তুই আমার জন্যে এত কষ্ট করছিস ?'

বললাম, 'করবো না ? বাড়িওয়ালার অত ভাড়া বাকি পড়েছে। এখন যদি তোদের সে-লোকটা রাস্তায় বার করে দেয় ? তাহ'লে কী হবে ?'

শাশ্বত হাসতে-হাসতে বললে, 'তখন রাস্তাতেই বাস করবো! কত লোক তো রাস্তাতেই ঘর-সংসার পেতে বসেছে, দেখিসনি ? তাতে কী হয়েছে ? দেখিসনি, সেখানেই তাদের বিয়ে হচ্ছে, রাস্তার কলে চান করছে, আয়নাতে মুখ দেখতে-দেখতে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে, তারা যদি রাস্তায় থাকতে পারে তো আমরা রাস্তায় থাকতে পারব না কেন ? আমরাও তো তাদের মতো গরীব লোক রে—'

বললাম, 'তুই যে বলেছিলি তোর মামা পুলিস-কমিশনার ? তোর মামাকে একবার খবরটা দে না। দেখ না, তোর মামা যদি কিছু করতে পারেন!'

শাশ্বত বললে, 'দূর, ও-সব বাজে কথা!'

আমি বললাম, 'বাজে কথা মানে'

শাশ্বত বললে, 'আমি তোকে সব বাজে কথা বলেছিলাম।'

বললাম, 'তুই বাজে কথা বলেছিলি?'

শাশ্বত বললে, 'হ্যাঁ-রে, সমস্ত বাজে কথা। তুই বুঝতে পারিসনি ?'

আমি বললাম, 'না। তুই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলি ?'

শাশ্বত বললে, 'তুই বড় সরল। অত সরল ভাল-মানুষ হলে এ যুগে চলে না রে! তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে। এ তো মিথ্যের যুগ, ধাপ্পাবাজির যুগ রে। ধাপ্পা না দিতে পারলে আমরা এখানে কেউ টি কতে পারব না ভাই।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তোকে এতদিন যা কিছু বলেছি, সব মিথ্যে কথা ভাই। এই তোরাই আমাদের মিথ্যেবাদী-ধাপ্পাবাজ বানিয়েছিস। তোদের টেক্কা দেখার জন্যেই আমাকে বলতে হয়েছিল আমার মামা পুলিস কমিশনার, তোদের টেক্কা দেবার জন্যেই বলতে হয়েছিল আমার বন্ধু নাটোরের মহারাজা। কতদিন আমাকে আর আমার মাকে না খেয়ে আর উপোস করে থাকতে হয়েছে, তা জানিস ? তোদের কাউকে তা জানাইনি। নিজের দুঃখের কথা এ যুগে অন্যদের বললে তারা কি আমার উপকার করবে কেউ ? শুধু হাসবে। এ-যুগে দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না ভাই, তাই তো বড়-বড় কথা বলতুম তোদের কাছে, যাতে তোরা আমাকে একটু পাত্তা দিস্!'

বললাম, 'কিন্তু তা- বলে আমার কাছেও তুই ধাপ্পা দিবি ?'

শাশ্বত বললে, 'কী করব আমি বল ? ছোট বয়েসে জ্ঞান হবার আগেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়েস ছ'মাস। সেই ছ'মাসের বাচ্চাকে নিয়ে মা পরের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বড় করেছেন। একটু জ্ঞান হতেই দেখলুম, পৃথিবীটা বড় খারাপ জায়গা। তোর সুখের ভাগ নিতে সবাই তৈরি, কিন্তু তোর দুঃখের ভাগ কেউ নেবে না। আমি যদি লোকদের বলি আমি ঝিয়ের ছেলে, তাহ'লে ভালবাস দূরে থাক, সবাই আমাকে ঘেন্না করবে। তাই তখন থেকেই মিথ্যে কথা বলা শুরু করলাম। এক কথায় বলতে গেলে এই সমাজটাই আমাকে মিথ্যেবাদী-খাপ্পাবাজ করে তুলল। কিন্তু মা'র কাছে যখন শুনলুম তুই আমাদের বাড়িয়ালার বাকি ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিস, আমার স্কুলের ছ'মাসের মাইনে দিয়ে খাতায় আমার নাম আবার উঠিয়েছিস, তখন তোর ওপর আমার ধারণা বদলে গেল। আমার জন্যে সত্যিই তুই খুব কষ্ট পাচ্ছিস, না-রে ?'

আমি বললাম, 'কষ্ট তো পাচ্ছিই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট পাচ্ছি তোর কথা ভেবে। তোদের যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তো তোরা কোথায় যাবি, তাই-ই কেবল ভাবছি—'

শাশ্বত বললে, 'আমাদের কথা তুই কিছু ভাবিসনি। আমাদের মতন আরও অনেক গরীব লোক আছে এই কলকাতায়, তুই একলা কত গরীব

লোকের দুঃখ দূর করতে পারবি। আমাদের মতো লোক চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, আমাদের বোধহয় মরাই ভাল রে—আমাদের মতো লোকের বেঁচে থাকাটাই অন্যায়!'

বলে শাশ্বত বোধহয় কাঁদতে লাগল। অন্ধকারে তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু খানিক পরে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সেই কান্নার হঠাৎ শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

যখন চোখ চাইলাম, দেখি দিনের আলোয় চারদিকে আলোময় হয়ে উঠেছে। ভাবলাম এ কোথায় রয়েছি আমি? সামনে আমার কে দাঁড়িয়ে?

মনে হল ডাক্তার। কারণ ভদ্রলোকের গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে। তাহ'লে কি আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম এতক্ষণ?

তারপরেই বাবার গলা শুনতে পেলাম। বাবা বললেন, 'ওই তো চোখ খুলেছে, তাহ'লে জ্ঞান হয়েছে এখন!'

আশেপাশে চেয়ে দেখলাম মাও দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণে। তার কাছে দাদারা। সকলের মুখের চেহারাই গম্ভীর। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কী হয়েছে। তাহ'লে হয়তো আমি স্বপ্নের মধ্যেই শাশ্বতকে দেখেছি।

বাবা বললেন, 'এখন কেমন দেখলেন?'

ডাক্তারবাবুর কথাও কানে এল। বললেন, 'মনের কোনও জায়গায় আঘাত লাগলেও এ-রকম হয়। চার্টটাও ঠিক আছে। আমার মনে হয় মেন্টাল শকের জন্যেই এটা হয়েছিল। জ্বরটা যখন চলে গেছে, তখন আর কোনও ভয় নেই—'

দাদা উদ্বিগ্ন চোখে বললেন, 'কিন্তু মানসিক শক্ কিসে হতে পারে? এইটুকু বয়েসে তো মনে কোনও আঘাত লাগা সম্ভব নয়।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ছোট বয়েসে অনেক সময় কারও কাছ থেকে বকুনি খেলেও এ-রকম হতে পারে! কেউ কি ওকে কিছু বলেছিল?'

বাবা বললেন, 'আমিই ওকে বকেছিলুম!'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কী করেছিল ও?'

বাবা বললেন, 'ওর স্কুলের একটা ছেলের মাকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। তাদের বাড়িওয়ালা তাদের উচ্ছেদ করতে চাইছিল। তাই তার বিধবা মায়ের হয়ে আমাকে ব্যবস্থা করতে বলেছিল। সেই নিয়ে আমার সঙ্গে ওর খুব তর্ক হয়। তর্কের সময় তো খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমাকে অনেক যা-তা কথা শুনিয়েছিল। আমিও ওকে দু'কথা শুনিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর ও রাত্তিরে রাগ করে আর কিছু খায়নি। আমি ওকে একতলার একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল ঘরের ভেতরে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। তারপর গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তখন পাড়ার ডাক্তারকে ডাকা হল। কিন্তু সেইদিন থেকেই ও প্রলাপ বকছিল।'

ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন, 'খুব অন্যায় করা হয়েছে ওর ওপর। আমরা বড়রা সাধারণত ছোট ছেলে-মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করি না। তাদেরও যে মন বলে একটা জিনিস আছে তা ভাবি না। ওকে তালা-চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে না-খেতে দিয়ে খুবই অন্যায় করেছিলেন। যা হোক, এখন থেকে ওর ওপর যেন কোনও মানসিক পীড়ন না হয়। তা যদি করেন, তাহ'লে আর ওকে বাঁচানো যাবে না।'

আমি কান পেতে সব শুনছিলাম। আমি একবার নিজেই ওঠবার চেষ্টা করতে গেলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন। বললেন, 'এখন ওর ওঠা-হাঁটা একদম বারণ। অন্তত এক মাস-দেড় মাস কেবল বিছানায় শুয়ে থাকবে ও। আর সব সময়ে যে কেউ একজন ওর কাছে বসে থাকা চাই।'

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

আমাকে এক-দেড় মাস এমনি বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে শুনে আমি খুব কষ্ট পেলাম মনে-মনে। তারপর আবার আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। মনে আছে, কী কষ্টে আমার সে দিনগুলো গেছে। হয় বাবা, নয় মা সারা দিন আমার পাশে বসে থাকতেন। মা মাঝে-মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'এখন কেমন আছিস রে?'

আমি বলতাম, 'আমি কবে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারব?'

মা বলতেন, 'এখন শরীর তোর খারাপ, একটু ভাল হয়ে উঠলেই বেড়াতে পারবি।'

আমি বলতাম 'কবে ভাল হব আমি?'

মা বলতেন, 'এত বড় একটা ভারী অসুখ গেল, এখন তোর ভাল হতে আর কিছুদিন সময় লাগবে।'

'আর কতদিন সময় লাগবে?'

মা বলতেন, 'এবার ডাক্তারবাবু এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। তিনি বললেই তুমি হেঁটে বেড়াতে পারবে?'

ডাক্তারবাবু আমাকে দেখতে এলে তাঁকেও আমি ওই একই কথা জিজ্ঞেস করতাম। বলতাম, 'আবার কবে উঠতে পারব ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু বলতেন, 'আর বেশি দিন শুনে থাকতে হবে না তোমাকে। আর একটু সুস্থ হয়ে নাও। যে-ওষুধটা দিলুম, এটা খেয়েই গায়ে একটু জোর পাবে, তখন তুমি স্কুলে যেতে পারবে!'

তারপর ভাল হতে আরও প্রায় দু'এক মাস লাগল। শরীর তখনও দুর্বল। ভালো করে ঘুম হয় না। দিনের বেলা ঘরের মধ্যে একটু-আধটু ঘোরা-ফেরা করি। কিন্তু একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

শেষকালে অনেক কষ্টের পর একদিন সুস্থ হয়ে উঠলাম। সেদিন দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আর থাকতে পারলাম না। মনটা যেন কেমন ছট্‌ফট্ করতে লাগাম। টিপি-টিপি পায়ে সদর দরজাটা খুলে রাস্তায় বেরোলাম। তারপর টলতে-টলতে হাজির হলাম শাশ্বতদের বাড়িতে।

বাইরে থেকে ডাকতে লাগলাম, 'মাসিমা, ও মাসিমা—'

দরজার কড়া নাড়া শুনে কে একজন বাইরে বেরিয়ে এল।

একেবারে অচেনা মুখ। জিজ্ঞেস করলে, 'কে?'

আমি বললাম, 'মাসিমা, মাসিমা বাড়িতে নেই?'

মহিলাটি তবু বুঝতে না পেরে বললেন,—'কার মাসিমা? কোন মাসিমা'?

আমি বললাম, 'এখানে শাশ্বত থাকে না? শাশ্বত আমার বন্ধু, আমরা একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পাড়ি। তারা তো এই বাড়িতেই থাকতো। তারা নেই?'

মহিলাটি বললেন, 'তারা দু'মাস আগে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বাড়িওয়ালা তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। আমরা এ-বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছি—'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তারা এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

মহিলাটি বললেন, 'না।'

বলে দরজাটা দড়াম্ করে আমার মুখের ওপরেই বন্ধ করে দিলেন।

আমি আর কী করব! খানিকক্ষণ সেখানেই হতভম্বের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শরীর তখন আমার আরও টলছে। তাহ'লে কি যা ভয় করেছিলাম, তাই-ই হয়েছে? তাদের কি বাড়িওয়ালা শেষ পর্যন্ত জোর করে

তাড়িয়ে দিয়েছে! বাড়ির দিকে যাব কি না ভাবছি। কিন্তু ভয় হচ্ছিল, যদি রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে পড়ে যাই?

দেখলাম, একজন লোক আসছে রাস্তা দিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ মশাই, বলতে পারেন এখানে এই বাড়িতে যারা থাকত, তারা কোথায় গেল?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এ-পাড়ার লোক নই, আমি অন্য পাড়ায় থাকি, এ-পাড়ার খবর আমি বলতে পারব না—' বলে ভদ্রলোক যে-দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন।

আমি সেই দুর্বল শরীর নিয়ে আর কোথায় বা যাব, তখন আর কাকেই বা জিজ্ঞেস করবো। আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু শরীর তখনও টলছে। মাথাও ঘুরছে! তারপর হঠাৎ কী যে হল, মাথাটা বোঁ-বোঁ করতে লাগল। মনে হলো, যেন আমি পড়ে যাব।

তারপর আমার কিছু মনে নেই। তারপর যখন চোখ খুললাম, দেখি ডাক্তারবাবু আবার আমার সামনে বসে আমার বুক পরীক্ষা করছেন। আমার বাবা-মা-দাদারাও পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কথাবার্তা থেকেই জানতে পারলাম যে, আমি নাকি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কারা বুঝি সেই অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে এনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

আমি যে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম, এও আমার পরম সৌভাগ্য। তার পরদিন থেকে সবাই সব-সময় পাহারা দিত, যাতে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে না পারি।

তারপর ক্রমে-ক্রমে সুস্থ হয়েছি। আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছি পৃথিবী তার আপন নিয়মে ঘুরতে-ঘুরতে কত বছর এই সূর্যটাকে প্রদক্ষিণ করেছে। তারপর জীবন-চক্রের নাগরদোলায় চেপে আরও কত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। আমরাও সেই আর আগেকার পাড়ায় নেই। আমার বাবা-মাও মারা গেছেন। আমরা ভাই-ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছি। কোথায় রইলো সেই মাসিমা—তাদের খবর রাখবার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনটাই আর হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ এত বছর পরে আমার অফিসে শাশ্বতকে দেখে তাই একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার খবর কী করে পেলি তুই?'

শাশ্বত চা খেতে-খেতে বললে, 'আজকাল তোর নাম কে-না জানে। যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসিমা কেমন আছেন?'

শাশ্বত বললে, 'কোনও মানুষ কি এতদিন বাঁচে? আমি মা'কে অনেক কষ্ট দিয়েছি ভাই। মা মুখ বুঁজে সমস্তই সহ্য করে গিয়েছেন। এ দুঃখ আমার কোনদিনই যাবে না।'

বললাম, 'তা এতদিন পরে আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে, তাই বল—'

শাশ্বত বললে, 'আজও তোকে মিথ্যে বলেছি, ভাই। ছেঁড়া জামা আর প্যাণ্ট পরে তোকে ধোঁকা দিয়েছি। এখন আর আমি গরীব নই। একটা বাড়ি করেছি, সেইজন্যে…'

'বাড়ি? নতুন বাড়ি?'

'হ্যাঁ, সেই বাড়ির গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে একটা ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন করেছি। তোকে সেদিন আসতে হবে।'

'কবে?'

'আসছে বুধবার—' বলে আমার দিকে একটা ছাপানো কার্ড এগিয়ে দিলে। দেখলাম, ঠিকানা বালিগঞ্জের রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ নিশ্চয়ই খুব বড় বাড়ি।

বললাম, 'কত খরচ পড়ল তো বাড়িটা তৈরী করতে?'

শাশ্বত বললে, 'প্রায় পাঁচ লাখ টাকার কাছাকাছি—একটা পুরনো বাড়ি ছিল আগে, সেটা দু'লাখ টাকায় কিনে ভেঙে ফেলেছিলাম, তারপর সেই জমির ওপর নতুন বাড়ি তৈরি কর'তে লাগল আরও তিন লাখ টাকা। এই হল মোট পাঁচ লাখ টাকা।'

আমি যেন আমার চোখের সামনে তখন সর্ষেফুল দেখছি! যে শাশ্বত'রা একদিন দশ টাকা করে মাসে বাড়ি-ভাড়া দিতে না পারার জন্যে বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল, সেই শাশ্বতই কি এই শাশ্বত! মনে হলো, আমি যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শুনছি।

বললাম, 'কী করে এ-রকম হল রে? তুই তো স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলি—'

শাশ্বত বললে, 'তুই জানিস বোধহয়, আমাদের একদিন দশ-টাকা বাড়ি-ভাড়া দেবার মতো ক্ষমতা ছিল না। আমাদের বাড়ি-ভাড়ার টাকাও একদিন তুই-ই দিয়ে দিয়েছিলি, আমার স্কুলের খাতাতে আমার নাম কাটা যাবার পরও তুই-ই ছ'মাসের মাইনে দিয়ে দিয়েছিলি।'

বললাম, 'তুই জানতে পেরেছিলি সে কথা?'

শাশ্বত বললে, 'জানব না কেন? কিন্তু ভাই আমি সেই লজ্জাতেই তোর সঙ্গে দেখা করতুম না।'

বললাম, 'কিন্তু তাতে লজ্জা কিসের?'

শাশ্বত বললে, 'আমি তোর সামনে যত রাজ্যের মিথ্যে কথা বলতুম, তাইই তো বড় লজ্জা করত আমার। আমার মা নাজিরদের বাড়িতে ঝি-য়ের কাজ করতেন, তাতেও আমার বড় লজ্জা হত। আমি তাই মা'কে খুব বকতাম। বলতাম, কেন তুমি বিনুকে সব কথা খুলে বলে দাও? আমার আমার মা শুনে বলতেন, বলতে লজ্জা কিসের তাতে? আমরা তো নিজের দোষে গরীব হইনি। ভগবান আমাদের গরীব করলে আমরা কী করব।'

একটু থেমে শাশ্বত আবার বলতে লাগল, 'ছ্যাখ, ছোটবেলায় আমি কত বোকা ছিলুম। গরীব হওয়ার মধ্যে যে লজ্জার কিছু নেই, সেটা তখন বুঝতাম না ভাই। তাই তোদের চোখে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে কেবল বড়-বড় কথা বলে তোদের ধাপ্পা দিতুম। তোকে কতবার বলেছি, আমার মামা পুলিস-কমিশনার, সে-কথা তোর মনে আছে?'

বললাম. 'খুব মনে আছে।'

'তখন তুই আমার কথা শুনে কী ভাবতিস্?'

বললাম, 'আমি তোর কথা সব বিশ্বাস করতুম প্রথম-প্রথম।'

'তারপর?'

বললাম, 'তারপর তোর মুখে বড়-বড় কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হতো তোর জন্যে। তুই জানিস্ না আমি তোকে কত ভালবাসতুম। তোর জন্যে ভেবে-ভেবে আমার অসুখ করে গিয়েছিল। আমার বাবা-মা'র কাছেও সে-জন্যে কতবার কত বকুনি খেয়েছি। শেষ পর্যন্ত একদিন বাবা আমাকে আমার ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে তালা-চাবি বন্ধ করে দিলেন, যাতে আমি তোদের বাড়ি না যেতে পারি। আর সেই রাত্রেই আমার এমন অসুখ হল যে, দেড়-মাস আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। তারপর একদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে তোদের বাড়িতে তোকে খুঁজতে গেলুম, দেখি তোরা সে-বাড়িতে আর নেই। তার আগেই বাড়িওয়ালা তোদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে।'

শাশ্বত বললে, 'সেদিন খুব কষ্ট গেছে ভাই আমাদের। একে মা'র শরীর খারাপ, তার ওপর কোর্টের পেয়াদা আর পুলিশ এসে আমাদের ঘরের সব জিনিসপত্র ছুড়ে-ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। মনে আছে, মা সেদিন রাস্তায় বসে পাড়ার সমস্ত লোকের চোখের সামনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলেন—'

কথাগুলো বলতে-বলতে শাশ্বত'র চোখ-দু'টো ছল-ছল করে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কোথায় গিয়ে উঠলি তোরা?'

এর জবাবে শাশ্বত যা বললে, তা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। সেদিন

সে-বস্তি ছেড়ে আর-একটা বস্তিতে গিয়ে উঠল মাসিমা আর শাশ্বত। সেটা ঘর নয়, সেটাকে ঘর না বলে রাস্তা বললেই ঠিক বলা যায়। মায়ের কষ্ট দেখে শাশ্বত'রও সেদিন যে-শিক্ষা হয়েছিল, তাই-ই তাকে ভবিষ্যতের সঠিক রাস্তা দেখিয়েছিল। সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মায়ের একদিন খুব জ্বর হল। শাশ্বত'র কাছে তখন একটাও পয়সা নেই যে, ডাক্তার ডেকে দেখায়। মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। শেষকালে বস্তির লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে কোনো রকমে কয়েকজনের হাতে-পায়ে ধরে মা'কে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে এলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর ?'

শাশ্বত তারপর সংসারে একেবারে একলা হয়ে গেল। তখন মাথা গোঁজবার মতো, অবলম্বন করবার মতো একটা আশ্রয়ও নেই তার। সে তখন সত্যিকারের সিঃসহায়, নিঃসম্বল। সে একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করল। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখলে একটা ট্রেন ছাড়ছে। সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় সে উঠে বসল। ভোরবেলা ট্রেনটা গিয়ে পৌঁছল কাশীতে। স্টেশনে নেমে সকলের নজর এড়িয়ে শহরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। হাঁটতে-হাঁটতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে তখন অনেক লোক গঙ্গায় স্নান করছে। সকাল-বেলার গঙ্গা। লোকে বললে তার নাম 'দশাশ্বমেধ ঘাট'। কেউ স্নান করছে। কেউ ভিক্ষে করছে। শাশ্বতও গিয়ে দাঁড়াল তাদের মধ্যে। এক জায়গায় ভীষণ ভিড়! সেখানে একজন বিধবা মহিলা ভিখারিদের কচুরী বিলোচ্ছিলেন। শাশ্বত নিজেও সেখানে হাত পেতে দাঁড়াল। তার হাতেও দু'খানা কচুরী পড়লো। অনেকদিন পরে শাশ্বত'র পেটে কিছু পড়ল। সেই দশাশ্বমেধ ঘাটেই সে-দিনটা কাটল। কিন্তু তারপর ? কী করে পেট চলবে ?

কিন্তু পরের দিনও সেই মহিলাটি আবার এসে কচুরী বিলোতে লাগলেন। স্নান করে বাড়ি ফিরছেন তখন শাশ্বত তাঁর পিছু নিলে।

মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুই ?'

শাশ্বত সেদিন প্রথম সত্যি কথা বললে। বললে, 'মা আমি একজন গরীবের ছেলে। সংসারে আমার কেউ নেই—'

মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাস্ তুই ?'

শাশ্বত বললে, 'আমি আপনার সেবা করতে চাই মা।'

—'সেবা ?'

শাশ্বত বলে, 'আমি শুধু আপনার কাছে থাকব, আর আপনার সেবা করব। তার বদলে আমাকে দু'টি খেতে দেবেন।'

শাশ্বত বলতে লাগল, 'সেই-ই প্রথম জানলুম ভাই যে মিথ্যে বড়াই করে বড়লোকে সাজার চেয়ে সত্যি কথা বলে ছোট হলেই জীবনে লোকের কাছে থেকে বেশি ভালবাসা পাওয়া যায়।'

তারপর সেই মহিলার সঙ্গে শাশ্বত তাঁর বাড়িতে গেল। সেখানে গিয়ে নিজের দারিদ্র্যের কাহিনী বলে গেল। সেদিন থেকে সেই বাড়িতেই সে থেকে গেল। আর তার বদলে দুটি খেতে পেলে।

আমি চুপ করে শাশ্বত'র সব কথা শুনছিলাম। বললাম—'তারপর ?'

শাশ্বত বললে, 'তারপর জানি না কী করে কী হল। সমস্ত কথা বলবার এখন সময় নেই। পরে একদিন বলব। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই কাশীতেই আমি আমার জীবনের চরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম।'

'কী করে ?'

শাশ্বত বললে, 'ওখানকার এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল যাঁর বাড়িতে অনেক বই। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে বই পড়তে আরম্ভ করলাম, যত বড়লোকদের জীবনীগুলো পড়তে-পড়তে লক্ষ্য করলাম যে, গরীব হওয়া লজ্জারও জিনিস নয়, আর অপমানেরও জিনিস নয়। সব বড়-বড় লোক প্রথম জীবনে গরীবই ছিলেন, তারপর ঘা খেয়ে-খেয়ে বড় হয়েচেন। ওইগুলো পড়ে আমি বুকে খুব সাহস পেলাম ভাই। তখন থেকে আমার মনে একটা ধারণা হল যে জীবনে হতাশ হওয়াটাই সবচেয়ে বড় পাপ। একদিন বুড়ি-মায়ের কাছ থেকে ছ'আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে একটা ঝুড়ি কিনে নিলাম বাজার থেকে। সেই ঝুড়িতে করে ছোলাভাজা বিক্রি করতে শুরু করলাম।'

আমি বললাম, 'তোর লজ্জা করল না ?'

শাশ্বত বলেল, 'না, তখন থেকে লজ্জা করা ছেড়ে দিলাম, সত্যি কথা বলা শুরু করলাম। আমার বুড়ি-মাকে সব কথা খুলে বললাম। বুড়ি মাও বললেন—খুব ভাল করেছিস্। সঙ্গে-সঙ্গে রোজ একবার বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে প্রণামও করে আসবি। তাহ'লে দেখবি, তোর খুব উন্নতি হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর ?'

শাশ্বত বলতে লাগল, 'তারপর সেই ছ'আনা পয়সা দিয়ে ঝুড়ি কিনে

ছোলাভাজার ব্যবসা থেকে শেষকালে আজ আমি বড়বাজারে মস্ত বড় আড়তদার। আমি এখন লাখ-লাখ টাকার মাল সাপ্লাই করি ফরেন্‌ কান্টি তে। আমার অফিসে এখন দেড়শো লোক খাটে। কিন্তু আমি এখনও বুড়ি-মায়ের সেই উপদেশ মেনে চলেছি। আমি এখনও এইরকম সাদাসিধে পোশাক পরে চালাচ্ছি, মিথ্যে কথাও বলি না, বাজে লজ্জাও আমার নেই—'

'কিন্তু মিথ্যে কথা না বললে কি ব্যবসা করে বড়লোক হওয়া যায়?'

শাশ্বত বললে, 'বড় হওয়া যে যায় তা তো আজ আমি নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে দিয়েছি। এইটুকু সময়ের মধ্যে সব কথা বলা যাবে না। অন্য একদিন বলবো তোকে সব। আমার অফিসে একদিন তোকে নিয়ে যাব। তাহ'লে আসছে বুধবার দিন গৃহপ্রবেশের ব্যাপারে যাচ্ছিস তো?'

বললাম, 'নিশ্চয় যাবো।'

শাশ্বত চলে গেল। আমি আমার অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম, একটা দামী গাড়িতে গিয়ে উঠল শাশ্বত। সেই সাদাসিধে পোশাক, সাধারণ চেহারা। মনে হলো, ওকে যেন ওই গাড়িতে মোটেই মানাচ্ছে না।

ঠিক দিনে ঠিক সময়ে শাশ্বত'র দেওয়া কার্ডের ঠিকানা, দেখে সন্ধ্যেবেলা যথাস্থানে পৌঁছে আমি আরও অবাক। এ কী করেছে শাশ্বত! এ যে একেবারে রাজকীয় ব্যাপার। সত্যিই কি শাশ্বত যা বলেছে সব সত্যি? আজকালকার যুগে তো সবাই বলে ধাপ্পাবাজি না করলে বড় হওয়া যায় না। যত দিন যাচ্ছে, ততই তো এ-ধারণাটা লোকের মনে দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে। সবাই তো বলে এ-যুগ ধাপ্পাবাজির যুগ, মিথ্যে কথার যুগ, ট্যাক্স-ফাঁকি দেবার যুগ। তাহ'লে শাশ্বত'র এ-সব হল কী করে? সৎপথে থেকেও কি এত ঐশ্বর্য করা যায়? আমার বড় সন্দেহ হল। নাকি শাশ্বত আমাকে যা বলে গিয়েছিল সব মিথ্যে?

নতুন বাড়ি। পুরনো বাড়িটা দু' লাখ দিয়ে কিনে, ভেঙে ফেলে তারপর সেই জমিতে আরও তিন লাখ টাকা খরচ করে এই বাড়িটা করেছে।

সামনে অসংখ্য গাড়ির সার। অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলুম। কোথায় কোনো চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবু এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে কে আমায় ডাকলে। আমি পেছন

ফিরেই দেখি শাশ্বত। সেই একই সাদা-সিধে পোশাক, সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী-চটি। দেখি চোখদু'টো জলে ভরে গিয়ে ছল্-ছল্ করছে।

আমার দিকে চেয়ে শাশ্বত একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'তুই এসেছিস? আমি খুব খুশি হয়েছি ভাই।'

আমি বললাম, 'তোর এ রকম চেহারা কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

শাশ্বত বললে, 'না, ও কিছু নয়—'

বলে এক হাত দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে বললে, 'সেই সবই শেষ পর্যন্ত হলো ভাই, কিন্তু আমার মনে তেমন আনন্দ নেই।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন রে?'

শাশ্বত বললে, 'আজ কেবল আমার মা'র কথা মনে পড়ছে ভাই। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই হলো আমার, কিন্তু যিনি এ-সব দেখলে সবচেয়ে খুশি হতেন সেই মা'-ই আজ আর নেই, মা কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।'

———



লাট সাহেব খুন

মনসাতলার ঘাটে একদিন এক সাধু এসে হাজির হল।

আমাদের দেশে সাধারণত কোনও ঘটনা ঘটে না। আমাদের জীবন নিয়ম করে চলে। আমরা নিয়ম করে ইস্কুলে যাই, নিয়ম করে ইস্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে আসি। নিয়ম করে মাঠে ফুটবল খেলতে যাই। তারপর ঠিক নিয়ম করে রাত্তির বেলা বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তার পরদিন আবার সেই একই নিয়মে পুব দিকের আকাশে সূর্য ওঠে, আর আমরা সেই নিয়মের চাকায় গড়িয়ে-গড়িয়ে আবার আগের দিনের মত চলি।

বেড়াপোতা গ্রামের জীবন তাই বড় সহজ, বড় সরল। আমরা আকাশে মেঘ করলে বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ হবার ভয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকি। যদি কোনও দিন বে-নিয়ম করবার ইচ্ছে হয় তো, মনসাতলার ঘাটে গিয়ে আমরা মাঝে-সাঝে বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খাই।

মনসাতলার ঘাটে সব চেয়ে যেটা আমাদের মনকে টানত, সেটা হল ওই বটগাছটা। মনসাতলার ঘাটে আর-কিছু ছিল না। না একটা খেয়া-পারাপারের নৌকা, না একটা বাড়ি। একটা কুঁড়েঘরও ছিল না আশে-পাশে তিন-চার মাইলের মধ্যে। তিন-চার মাইলের মধ্যে কেবল ছিল ধানের ক্ষেত। হু-হু করে যখন জোরে হাওয়া বইত, তখন ওই খেতের ওপর ধান-পাট-

সরষে-তিসি-পেস্তার লম্বা-লম্বা পাতার ওপর কী-রকম একটা শির্‌-শির্‌ শব্দ হত। দূর থেকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলে মনে হতো, যেন বাঁশি বাজছে। বিশেষ করে রাত্তিরে। তা রাত্তির বেলা আমরা ও-দিকে যেতুম না। আর আমাদের যাবার দরকারও হতো না ওদিকে।

বেড়াপোতা গ্রামের লোকেরা কিছু কেনা-বেচা করতে গেলে উত্তর দিকে যেত। উত্তর দিকে পাঁচ মাইল দূরে ছিল বাজার-হাট-দোকান। সেইখানেই রেলের ইস্টিশান। ওই ইস্টিশানে নেমে বাসে চড়ে আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে আসতে হত। এমনি পুবেও ছিল বসতি-অঞ্চল। পশ্চিমে ছিল মালোদের পাড়া। ঝুড়ি-ঝাঁটা-মাদুর কিনতে হলে সেখানে যেতে হতো।

কিন্তু মনসাতলার ঘাটের দিকে আমাদের যেতে হত শুধু ওই বট-গাছের ঝুরি ধরে ঝোলবার জন্যে। কারণ, নামেও যদিও মনসাতলার ঘাট, কিন্তু সে-ঘাট কেউ-ই ব্যবহার করত না। কারো যাবার দরকারও হতো না সেদিকে।

অনেককাল আগে মনসাতলার ঘাটে ফেরি নৌকা চলত। বেড়াপোতা থেকে ওপারে যেতে হলে ওইখানে খেয়া-নৌকায় চড়তে হতো। তখন এপারে-ওপারে যাতায়াতের দরকার হতো আমাদের। ওপারের লোক এপারে আসত, এপারের লোকও ওপারে যেত। এপারে বেড়াপাতা আর ওপারে শ্যামকুড়। এপারে বেড়াপোতাতে আসত শ্যামকুড়ের লোকরা হাট করতে, আবার শ্যামকুড়ে হাট করতে যেত বেড়াপাতার লোকেরা।

কিন্তু যেদিন থেকে শ্যামকুড়টা পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে গেল, থেকে সেদিন খেয়া-নৌকোও বন্ধ হয়ে গেল, ওদিকে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। তখন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল মনসাতলার ঘাটের দিকে যাওয়া। একটু বেলা হলেই জায়গাটা কী-রকম থম্‌থমে্‌ হয়ে আসত। আশে-পাশের পাটের ক্ষেত থেকে লোকজন যে-যার বাড়িতে চলে যেত। তখন আমরা খেলা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চলে আসতাম।

সেবার অনেকদিন আর মনসাতলার ঘাটের দিকে আমরা যাইনি। হঠাৎ বাদল এসে বললে, 'ওরে মনসাতলার ঘাটে যাবি ? একটা সাধু এসেছে—'

'সাধু ?'

'হ্যাঁ-রে, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু।'

আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে সাধু অনেকবার এসেছে। সে-সব সাধু সাধারণ সাধু। গেরুয়া পড়ে তারা হঠাৎ এসে হাজির হত, আর আমাদের বারোয়ারীতলায় বসে ধুনি জ্বালিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে করত। কখনও-কারো অসুখ-বিসুখে ধুনির ছাই তুলে আমাদের হাতে দিত। তাতে কেউ

ভাল হয়ে যেত, আবার কেউ বা ভাল হতোও না।

কিন্তু এবার নাকি অন্য রকম। বাদল যা বললে, তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এ নাকি একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু। খাঁটি হিমালয় আর নকল হিমালয় বলে যে কোনও কথা আছে, তা আমি জানতুম না।

বাদল বললে, 'তুই কাউকে সাধুর কথা বলিসনি কিন্তু। নইলে মুশকিল হবে। সাধু কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছে।'

'কেন? বললে কী হবে?'

বাদল বললে, 'জানলে ভীড় হবে খুব। তাতে সাধুর সাধনার ব্যাঘাত হবে। সাধু খুব জপতপ করে তো?'

আমি বললাম, 'তা খাঁটি মিলয়ের সাধু এত জায়গা থাকতে এই বেড়াপাতার মনসাতলার ঘাটে হঠাৎ মরতে এলোই বা কেন?'

বাদল বললে, 'আমি সে-কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম সাধুবাবাকে। তা সাধুবাবা বললেন, এখানে একটা ছেলে আছে, তার বাবার অসুখ সারাতে—'

আমি তো কথাশুনে আরো অবাক! বাদলের বাবারই তো খুব অসুখ। বাদলের বাবা তো আজ দশ বছর ধরে হাঁপানি রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। অনেক ডাক্তার অনেক কবিরাজকে দেখানো হয়েছে, কেউ সারাতে পারেনি। বাদলের বাড়িতে আর একটা মানুষ নেই যে, রোজগার করে সংসার চালায়। বাদলের সংসার বলতে গেলে চলেই না। অর্ধেকদিন বাদলের বাড়িতে ভাতই রান্না হয় না। বলতে-বলতে বাদলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বললে, 'ভাই, এতদিনে মনে হচ্ছে ভগবান বলে একজন আছে রে। নইলে এত জায়গা থাকতে সাধুবাবা হিমালয় ছেড়ে আমাদের বেড়াপোতায় আসতে যাবেই বা কেন? সাধুরা সাধনা করে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কিছু চোখে দেখতে পায় যে! হয়তো, হিমালয়ে বসে সাধনা করতে-করতে আমার বাবার অসুখের কথাটা জানতে পেরে গিয়েছিল।'

বললাম, 'কিন্তু তুই কী করে এ সাধুর খবর জানলি?'

বাদল বললে, 'আমি একদিন রাত্তির বেলা স্বপ্ন দেখলুম ভাই। স্বপ্নে দেখলুম আমি বিছানায় শুয়ে আছি, আর সামনে একজন জটা-জুটধারী সন্নাসী দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে আমাকে ডাকছিস্ কেন?'

তা আমি বললুম, 'আমার বাবার বড় অসুখ, তার অসুখটা তুমি সারিয়ে দাও বাবা। তখন সাধুবাবা বললে, আমি তো তোদের বেড়াপোতাতেই এসেছি। তুই আমার কাছে কাল আসি, আমি ওষুধ দেব—'

আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লুম।

জিজ্ঞেস করলুম, 'তারপর ? তারপর তুই কী করলি ?'

বাদল বললে, 'তারপর ভাই সাধুর খোঁজে চারিদিকে ঘুরতে লাগলুম। তোদের কাউকে বলিনি। একা-একা সব জায়গায় যেতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও পাই না। শেষকালে মনসাতলার ঘাটের দিকে একদিন কী ভেবে গেলুম। ও-দিকটা একেবারে ফাঁকা। তখন সন্ধে হবো-হবো। কেউ কোথাও নেই। সাধুকে না দেখতে পেয়ে বাড়ির পথে ফিরছি, হঠাৎ দেখি বুড়ো বটগাছটার ভিতর থেকে কী-রকম একটা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভাবলাম, এখানে বটগাছের ভেতরে আবার ধোঁয়া কোথা থেকে আসছে। কাছে গেলাম ভেতরে উঁকি মেরে দেখি একমুখ দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক সাধু বসে-বসে গাঁজা খাচ্ছে। একেবারে ঠিক স্বপ্নে যে-রকম চেহারা দেখেছিলুম, সেই রকম চেহারার সাধু। হুবহু। দেখেই আমি তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লুম। বললুম, 'বাবা, আমি বাদল।'

'বাবা কিছু বললে না। যেমন গাঁজা খাচ্ছিল, তেমনি গাঁজা খেতে লাগল। বাবাও কথা বলে না, আর আমিও তখন বাবার পা ছাড়ি না। ভাবলুম, হয় এস্পার নয় ওস্পার। শেষকালে বাবার বোধহয় দয়া হল। হঠাৎ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, লে বেটা, লে।'

দেখি সাধুবাবা আমার দিকে হাতের মুঠো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি হাত পাততেই সাধুবাবা আমার হাতের মধ্যে কী যেন দিয়ে দিলে।

'সাধুবাবা বললে, 'ওইটে নিয়ে তোর বাবাকে খাইয়ে দিগে যা।'

আমি আমার হাতের মুঠো খুলে দেখতে যাচ্ছিলুম। সাধুবাবা বারণ করলে। বললে, 'এখন দেখিস নে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখিস্।'

দৌড়ে বাড়ি গেলুম। বাড়িতে তখন বাবার কবিরাজী ওষুধ খাবার সময়। ওষুধের সঙ্গে সাধুর দেওয়া ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। বাবা জানতেও পারলে না ভাই। তারপর থেকে বাবার অসুখটা কমে এল। এখন বাবা রাত্তিরে আরাম করে ঘুমোচ্ছে, আর আগেকার মতন তেমন কষ্ট হয় না বাবার।'

আমি বলতাম, 'কিন্তু তুই তো আমাকে এ-সব কথা কিছুই বলিসনি! তোর সঙ্গে রোজ দেখা হয়, আর এ-সব কথা তুই একেবারে চেপে গেছিস ?'

বাদল বললে 'আমি কী করব, সাধুবাবা যে কাউকে বলতে বারণ করছিল।'

'কিন্তু তারপর ? তারপর কী হলো ?'

বাদল বললে, 'তারপর ভাই এক কাজ করলুম। বাড়ি থেকে একটা কাঁঠাল দিয়ে সাধুবাবাকে খেতে দিয়ে এলুম। বললাম বাবা, আমার তো আর কিছু

বাদল বললে, 'তারপর ভাই অমি এক কাজ করলুম। বাড়ি থেকে একটা কাঁঠাল নিয়ে সাধুবাবাকে খেতে দিয়ে এলুম। বললাম বাবা, আমার তো আর কিছু দেবার নেই, এইটে তোমার জন্যে এনেছি, তুমি খাবে বলে। তা সাধুবাবা কী করলে জানিস? শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙলটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে বললে, এই আমি খেলুম। বাকিটা তুই খেগে যা।'

'কেন, সাধুবাবা কিছু খায় না নাকি?'

বাদল বললে, 'না।'

'কিছু খায় না তো বেঁচে আছে কী করে? উপোস্ করে থাকলে কী মানুষ বাঁচতে পারে?'

বাদল বললে, 'আরে, তুই কিছু বুঝিস না, সাধুবাবা কি মানুষ যে, উপোস করে থাকলে মরে যাবে? সাধুবাবা তো ভগবান রে। ভগবানই সাধু হয়ে আমাদের বেড়াপোতায় এসেছে। তুই কিছছু বুঝতে পারছিস্ না।'

সত্যিই আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা!

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বাবা কি সত্যিই ভাল হয়ে গেছে?'

'একেবারে ভাল হয়নি, কিন্তু সাধুবাবা বলেছে, আর কয়েকদিন পরে একেবারে পুরোপুরি ভাল হয়ে যাবে। আর কোনও ভয় নেই।'

'তারপর সেই কাঁঠালটার কী হল?'

'আমি কাঁঠালটা আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলুম। বাবা-মা'কে আমি সাধুবাবার কথা কিছুই বলিনি।'

আমি বললুম, 'কেন? বলিস্নি কেন?'

বাদল বললে, 'বললে যে সাধুবাবার ওষুধের ফল ফলবে না।'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহ'লে আমাকে বললি কেন?'

বাদল বললে, 'তোর কথা আলাদা। তুই তো আমার বন্ধু। তোর কথা আমি সব বলেছি সাধুবাবাকে।'

'আমার কথা কী বলেছিস?'

'বলেছি যে, আমার এক বন্ধু আছে, তার বড় ইচ্ছে যে, সে কবি হবে, বড় হয়ে সে ভাল কবিতা লিখবে! সে কি কবি হতে পারবে?'

'সাধুবাবা শুনে কী বললে?'

বাদল বললে, 'সাধুবাবা বললে তাকে তুই আমার কাছে নিয়ে আসিস। তার মুখের চেহারা দেখে তবে আমি বলবো সে কবি হতে পারবে কি না।'

তা-তখন আমার খুব ইচ্ছে ছিল, বড় হয়ে আমি মস্ত বড় কবি হব। রবিঠাকুরের মত ভাল-ভাল কবিতা লিখব। বাদল আমার ইচ্ছের কথা ভাল

করেই জানত। কিন্তু কবিতা যে লিখব, তা ছাপাবে কে? আমাদের বেড়াপোতা গ্রামে পত্রিকা কোথায়? বেড়াপোতা গ্রামের সবাই চাষ-বাস আর গল্প-গুজব করেই দিন কাটাতে। আর আমরা যারা ছোট, তাদের কাজ ছিল লেখা-পড়া করা আর ফুটবল খেলা। যখন ফুটবল খেলা থাকত না, তখন ফুটবল খেলা থাকত না, তখন সেই সময়টায় বন্ধুবন্ধব নিয়ে মাঠে বসে গল্প করা। কিন্তু সকলের সঙ্গে মিশেও আমার মন থাকত কবিতার দিকে। বাড়িতে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে বসে-বসে কবিতা লিখতুম। লিখে-লিখে আমার খাতার পর খাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু-কিছু লেখা শুধু বাদলকে পড়ে শোনাতুম। বাদল শুনে বলতো, 'চমৎকার হয়েছে! এ-লেখাটা তোর রবিঠাকুরের চেয়েও ভাল হয়েছে। তুই-এ লেখাটা কলকাতার কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দে।'

তার কথায় সাহস করে আমি কলকাতার কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দিলুম। সেই কবিতা ছাপা হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে সাত ক্রোশ দূরে গাঁয়ের বাজারে কাগজের স্টলে গিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতাম। কিন্তু মাস কেটে গিয়ে বছর চলে যেত, তবু আমার কবিতা ছাপার অক্ষরে উঠত না। অথচ দেখতাম আমার কবিতার চেয়ে অনেক খারাপ কবিতা ঘন-ঘন ছাপা হত। আমার মনে হত কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই বলেই আমার কবিতা ছাপা হচ্ছে না। কলকাতার ছেলেদের ওপর আমার খুব হিংসে হতো। ভাবতুম, তারা কী সুখেই আছে। যখন ইচ্ছে কাগজের অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে পারে, তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারে। সম্পাদকের সঙ্গে ভাব করলে কত সুবিধে।

কিন্তু মনের দুঃখ আমার মনেই চেপে রাখতে হতো। আমাদের মত মফস্বলের ছেলেদের মনের দুঃখ কেউই বুঝত না।

তাই এতদিন পরে বাদলের কথায় মনে খুব আনন্দ হল। সোজা পথে তো কিছু হল না, এখন দৈব উপায়ে যদি কিছু হয়। বাদলের নিজের বাবা বহুদিন ধরে ভুগছিলেন। তাঁরই যদি অতদিনকার পুরনো রোগ সেরে গিয়ে থাকে, তাহ'লে আমারও হয়তো কবি হওয়া হবে।

তা সেদিন সকাল বেলাই বাদল আমাকে বলে গেল—আজ বিকেলবেলা তুই মাঠে যাসনি, তোকে নিয়ে আমি মনসাতলার ঘাটে সাধুবাবার কাছে যাব। কাউকে যেন কিছু বলিসনি!

আমি তো তৈরীই ছিলুম। বাদলের কথামত সেদিন আর কোথাও বেরোলাম না। কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না। জানলার ধারে

বসে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম, কতক্ষণে বাদল আসে। দুপুরটা কোনও রকমে কাটল, কিন্তু বিকেলটা যেন আর মোটে কাটতেই চায় না। আমাদের বাড়ির সামনে গাবগাছ, আর তার তলা দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বেঁকতে-বেঁকতে একেবারে মনসাতলার ঘাটের দিকে। পাকিস্তান হবার আগে ওই রাস্তাটাই ছিল ঘাটে যাবার একমাত্র রাস্তা, কিন্তু এখন আর ও-রাস্তা দিয়ে কেউ হাঁটে না। দু'পাশের বাঁশ-ঝাড়ের পাতা পড়ে-পড়ে রাস্তাটাও একেবারে ঢেকে গেছে। দু'পাশের আশশ্যাওড়া আর আ-গাছা জন্মে রাস্তাটা মানুষের অগম্য হয়ে গেছে।'

শেষ পর্যন্ত দেখলাম, বাদল হন্‌হন্ করে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে। কাছাকাছি আসতেই আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'কী রে, এত দেরি কেন তোর?'

বাদল বললে, 'একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ভাই, হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই জামা গায়ে দিয়ে দৌড়োতে-দৌড়োতে আসছি। চল্‌চল্—'

আমরা দু'জনে শুকনো বাঁশপাতা মাড়াতে-মাড়াতে মনসাতলার ঘাটের দিকে চলতে লাগলাম। হিমালয়ের সাধুর কাছে যাচ্ছি। সে যা বলবে, সব অব্যর্থ মিলবে। সে কৃপা করলে মানুষ সব কিছু বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে, যে-যা চাইবে, ইচ্ছে করলে সাধুবাবা তাকে তাই-ই দেবে।

মনসাতলার ঘাটে পৌঁছোবার আগেই সেই বটগাছটা। বিরাট বটগাছটা চারিদিকে গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জটা-জুটধারী এক সাধুবাবার মত। এদিকে বহুকাল আসিনি। পাকিস্তান হবার পর মনসাতলার ঘাটেও আর কেউ আসে না বলেই জায়গাটা বিকেলবেলাতেও কেমন ছম-ছম করছে।

বাদল বললে, 'তুই একটু দাঁড়া এখেনে, আমি আগে একলা গিয়ে দেখে আসি 'সাধুবাবা কী করছে—'

আমি সেই ঝাপ্‌সা আলোয়-অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে রইলাম, আর একটু পরেই বাদল ফিরে এল। বললে, 'চল, সাধুবাবাকে তোর কথা বলেছি। তোকে নিয়ে যেতে বলছে সাধুবাবা—'

আমি বাদলের সঙ্গে-সঙ্গে সাধুবাবার দর্শনে চললাম। বটগাছটার পেছন দিকে গুঁড়িটা ফাঁক হয়ে বেশ একটা গুহার মতন সৃষ্টি হয়েছে। তার মাথার দিকটা দু'চারটে নারকোলপাতা দিয়ে ঢেকে সেখানে একটা চালা ঘরের মতন তৈরি করা হয়েছে। বাদল আমাকে সেইখানে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি দাড়িওয়ালা একটা লোক খালি-গায়ে বাবু হয়ে বসে আছে। আমাদের দু'জনকে দেখে বলে উঠল, 'এসো-এসো, বোসো—'

বাদল গিয়েই সাধুবাবার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাল। তারপর দু'টো পায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেই হাত মাথায় ঠেকাল। তার দেখা-দেখি আমিও

তাই করলুম। সাধুবাবা নিজের একটা হাত আমাদের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে। বললে, 'জয় রাম, জয় রাম—'

তারপরে আমার দিকে চোখ রেখে বাদলকে জিজ্ঞেস করলে, 'এই বুঝি তোমার সেই বন্ধু? এ-ই কি কবিতা লেখে?"

বাদল গদগদ হয়ে বললে, 'হ্যাঁ সাধুবাবা, এই-ই আমার সেই বন্ধু, যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলুম। এর বড় কবিতা লেখার শখ। কলকাতার সব কাগজে এ কবিতা লিখে পাঠায়, কিন্তু কেউ ছাপে না। আমরা তো মফস্বলে পড়ে থাকি, তাই আমাদের কথা কেউ ভাবে না। আমাদের তারা মানুষ বলেই মনে করে না। এ জানতে চায়, এর আশা পূর্ণ হবে কিনা—'

সাধুবাবা সব শুনলে। শুনে আমার দিকে চাইলে।

জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে, তুই কবি হতে চাস্?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, আমার খুব ইচ্ছে আমার কবিতা সব কাগজে খুব ছাপা হোক।'

সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলে, 'তোর লেখা-পড়া কদ্দূর? কোন ক্লাসে পড়িস্ তুই?'।

বললাম, 'আমরা দু'জনেই ক্লাস নাইনে পড়ি।'

সাধুবাবা আমার কথা শুনে বললে, 'কার কবিতা তোর পড়তে ভাল লাগে?'

আমি বললাম, 'রাধাচরণ বটব্যালের।'

সাধুবাবা অবাক হয়ে বললে, 'সে কী রে? এত কবি থাকতে তোর ভাল লাগে রাধাচরণ বটব্যালের কবিতা? কেন?'

বললাম, 'তাঁর কবিতা যে সব পত্রিকায় ছাপা হয়। তাই আমি তাঁর মতন করে কবিতা লেখবার চেষ্টা করি।'

সাধুবাবা বললে, 'রাধাচরণ বটব্যাল তোর আদর্শ? কিন্তু তাঁর চেয়েও তো বড় কবি আছে বাংলা দেশে। তাঁদের আদর্শ করিস্ নে কেন?'

বললাম, 'আমরা তো গাঁয়ে থাকি, সকলের কবিতা তো পড়তে পাই না, আমাদের গাঁয়ে সকলের কবিতার বইও পাওয়া যায় না! আপনি আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন, যাতে আমার হাত দিয়ে খুব ভাল-ভাল কবিতা যেন লিখতে পারি, যা পড়ে বড়-বড় লোক আমাকে সভা-সমিতিতে ডাকবে, আর আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে। আমার খুব নাম হবে, লোকে খুব

বাহবা দেবে আমাকে—'

সাধুবাবা আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে কী যেন ভাবলে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'হবে-হবে,তোর হবে!'

আমি তখন আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কতখানি নাম হবে আমার।'

সাধুবাবা বললে, 'অনেক নাম হবে। কিন্তু তার আগে তোকে একটা কাজ করতে হবে। ভাল্লুকের মাথায় ঘিলু জোগাড় করতে হবে পারবি?'

ভাল্লুকের মাথায় ঘিলু কোথায় পাব আমি? আমাদের গাঁয়ে তো ভাল্লুক নেই কোথাও। বাঙলা দেশে তো ভাল্লুক পাওয়া যায় না। তার মাথার ঘিলু কী করে জোগাড় করব?'

'আর বাঘের চর্বি। এই দু'টো জিনিস মিলিয়ে মধু দিয়ে নেড়ে অমাবস্যার রাতে খেলে কবি হওয়া যায়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু যারা বড় বড় কবি হয়েছে, তারা কি সবাই ওই সব খেয়েছে?'

সাধুবাবা বললে, 'তা কেন খেতে যাবে! তারা হে স্বভাবে কবি! তারা কবিতা না লিখে থাকতে পারে না, তাই তারা কবিতা লিখতে বাধ্য হয়।'

আমি বললাম, 'আমিও তো কবিতা না লিখে থাকতে পারি না।'

সাধুবাবা বললে, 'তোর বয়েসে সব বাঙালী ছেলেরাই কবিতা না লিখে থাকতে পারে না। সেটা অন্য জিনিস। সেটা এক রকমের রোগ বলতে পারা যায়। তারপর যখন তাদের বয়েস বাড়ে, সংসারের চাপ পড়ে তাদের মাথার ওপর, তখন সকলেরই কবিতা লেখা ঘুচে যায়। এই রোগটা বাঙালীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।'

সাধুবাবার কথায় আমার মনে খুব কষ্ট হল। আমার কবিতা লেখার নেশাটাও কি তাহলে রোগ? কিন্তু আমি যে শয়নে-স্বপনে সব সময় মনে-মনে কেবল কবিতা লেখার কথা ভাবি! রাধাচরণ বটব্যালেরও কি ছোটবেলায় এই রোগটা ছিল?'

সাধুবাবা বললে, 'তুমি রাধারচণ বটব্যালের নাম করছো বটে কিন্তু আমি তো তাঁর নামই শুনিনি! আমি যদি তাঁকে দেখতুম, তাহ'লে বলতে পারতুম, তাঁর ওটা নেশা কি অন্য কিছু।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাঁর নাম যে সবাই জানে! বাংলদেশে সবার কাগজে তাঁর লেখা ছাপা হয়ে বেরোয়।'

সাধুবাবা বললে, 'তা কারোর কবিতা ভাল হলেই কি সব কাগজে ছাপা

হয়? তার অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। হয়ত রাধাচরণ বটব্যবল কলকাতায় থাকেন। সব কাগজের লোকেদের সঙ্গে জানা-শোনা আছে। জানা-শোনা থাকলে শুধু কবি কেন, সব কিছুই হওয়া যায় আজকাল। নামজাদা গায়ক হওয়া যায়, নামজাদা শিল্পীও হওয়া যায়। জানা-শোনা থাকলে যেমন বড়-বড় অফিসে বড়-বড় চাকরি পাওয়া যায়, তেমনি বিখ্যাত-বিখ্যাত কবি শিল্পী-সাঁতারু-খেলোয়াড় অনেক কিছুই হওয়া যায়। অথচ কত গুণী লোক আছে আমাদের দেশে, তা জানিস্? তাদের কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই বলে কেউ তাদের নামও জানে না। কেউ তাদের খাতিরও করে না। তারা অজানাই থেকে যায়। তারপর একদিন চুপি-চুপি মারাও যায়। খবরের কাগজে তাদের মরার খবরও ছাপা হয় না।'

আমি বললাম, 'আমার যে কারোর সঙ্গেই জানা-শোনা নেই, আমরা গ্রামে থাকি, কার সঙ্গেই বা আমাদের জানা-শোনা থাকা সম্ভব এই অবস্থায়, আমাদের মত গাঁয়ের ছেলেদের কী হবে?'

সাধুবাবা বললে, 'আমার কথা যদি শুনিস তো তুই কবি হোসনে—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'ভাল কবিতা লিখলে কবির শুধু নিজেরই লাভ, দেশের লোকের কোনও লাভ নেই। কবি কবিতা লিখে নিজে নাম করে, নিজের নাম হয়, হয়ত নিজের টাকা হয়, কিন্তু লক্ষ-লক্ষ দেশের লোকের তাতে কী লাভ হবে?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু রাধাচরণ বটব্যালের কবিতা পড়ে যে আমার খুব আনন্দ হয়। সেটা কি কিছু না?'

সাধুবাবা বললে, 'কাঁচা তেঁতুল-নুন-লঙ্কা মিশিয়ে খেতেও তো অনেকের ভাল লাগে, সেটা তো হল চাটনি। চাটনিটা তো খাবার নয়, ভাত হল খাবার। ভাত খেলে শরীর ভাল হয়, কিন্তু শুধু চাটনি খেয়ে তো কেউ বাঁচে না। যাতে মানুষ বাঁচে, সেই চেষ্টা কর তোরা। সেইদিকেই তোরা মন দে।'

সাধুবাবার কথাগুলো ভাল লাগল না। আমরা তখন ছোট। লোকের ভাল কথা তখন আমাদের ভাল লাগার কথা নয়। আমরা তখন ফুটবল খেলতে, কবিতা লিখতে আর আড্‌ডা দিতে ভালবাসি।

সাধুবাবা হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কথাগুলো তোর শুনতে ভাল লাগল না? আমি জানতুম তোর ভাল লাগবে না, ছোটবেলায় কারোরই তা ভাল লাগবে না রে, আমারও ভাল লাগত না আগে। কিন্তু যখন বড় হলুম, তখন বুঝতে পারলুম, তখন বুঝতে পারলুম মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ হল মানুষকে ভালবাসা, মানুষের কষ্ট দূর

করা,দেশকে পরাধীনতা হাত থেকে মুক্ত করা।'

বাদল জিজ্ঞেস করলে, 'তাহ'লে ফুটবল খেলাটাও তো খারাপ ?'

সাধুবাবা বললে, 'না রে, কবিতা লেখাও কি খারাপ কাজ আমি বলেছি ? কবিতা লেখাকে যদি খারাপ কাজ বলি, তাহ'লে তো রবিঠাকুরকেও খারাপ লোক বলা হবে। কবিতা লেখা ভাল, কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে যদি দিন-রাত কবিতা লেখা নিয়ে কেউ পড়ে থাকে, সেইটেই খারাপ। আর তা-ছাড়া সবাই তো রাধাচরণ বটব্যাল, কি রবিঠাকুর হতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'তাহ'লে ওইযে আপনি বললেন ভাল্লুকের মাথার ঘিলু আর বাঘের চর্বি মধু দিয়ে নেড়ে খেলে কবি হওয়া যাবে ?'

সাধুবাবা বললে, 'হ্যাঁ, নির্ঘাত কবি হওয়া যাবে। কিন্তু তাতে বড় কবি হওয়া যাবে কিনা, তা আগে বলা যাবে না।'

'কেন ? আপনি তো ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। আপনি তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখতে পান, এ কথা আমাকে বাদল বলেছে। আমি ভবিষ্যতে বড় কবি হবো কি ছোট কবি হবো, তা বলতে পারেন না ?'

সাধুবাবা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল, কোথা থেকে একটা কেউটে সাপ সড়-সড় করে আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমরা ভয় পেয়ে যেখানে বসেছিলুম, সেখান থেকে লাফিয়ে উঠেছি। কী সর্বনাশ আমাদের কামড়ে দেবে নাকি ?

সাধুবাবা আমাদের দিকে চেয়ে বললে, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন, ও তোমাদের কিছুই বলবে না।'

সাধুবাবা বললে, 'কামড়াবে কেন তোমাদের মিছিমিছি ? তোমরা ওর কী করেছ ?'

বলে সাধুবাবা কেউটে সাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'আয়-বাছা আয়, এদিকে আয়—'

সাধুবাবার কথা শুনে সাপটা করলে কী, আস্তে-আস্তে সাধুবাবার কোলে উঠে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সাধুবাবাকে আদর করতে লাগল।

সাধুবাবা বিরক্ত হল। বললে, 'আঃ আবার এখন বিরক্ত করতে এলে কেন ! দেখছ, এদের সঙ্গে কাজের কথা বলছি, এখন কি বিরক্ত করতে হয় ? তুমি দিন-দিন বড় দুষ্টু হচ্ছো, এখন চুপ করে বোসো।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে সাধুবাবা বললে, 'এর খিদে পেয়েছে কিনা, তাই এই রকম দুষ্টুমি করছে।'

আমরা তো আরো অবাক। বললাম, 'এ-সাপটাকে কোথা থেকে

পেলেন।'

সাধুবাবা হাসল। বললে, 'না-না, এই বেড়াপোতাতেই পেয়েছি। আমার খবর পেয়েই এখানে আমার কাছে এসে জুটেছে।'

'ও কোথায় থাকে?'

সাধুবাবা বললে, 'কেন, আমার কাছেই থাকে।'

'রাত্তিরবেলায় কোথায় থাকে? কোথায় শোয়?'

সাধুবাবা বললে, 'আর কোথায় শোবে, আমার কাছেই শোয়।'

আমরা তখনও ওই দৃশ্য দেখে থর-থর করে ভয়ে কাঁপছিলাম। সাপ কোলে নিয়ে আদর করার ঘটনা আমরা আগে কখনও দেখিনি।

সাধুবাবা তখন সাপটার সঙ্গে একমনে এক-তরফা কথা বলে, 'ছিঃ অত দুষ্টুমি করে না, এরা সবাই নিন্দে করবে তোমার। চুপটি করে বোসো।'

আমরা তখন অবাক হয়ে সব দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ কী কাণ্ড! সাধুবাবার কী অদ্ভুত ক্ষমতা। কেউটে সাপের মত ভয়ঙ্কর জন্তুকেও কেমন আশ্চর্যভাবে বশ করে ফেলেছে। বাদল আমাকে কানে-কানে বললে, 'চল, আমরা চলে যাই, সাধুবাবা এখন বোধহয় খাওয়া-দাওয়া করবে।'

খানিকপরে আমরা উঠলাম। সাধুবাবা বললে, 'তোমরা আবার এসো?'

আমরা বাইরে চলে এলাম। সাধুবাবার কথা আমরা কাউকেই বললাম না। কারণ একবার জানাজানি হয়ে গেলেই সাধুবাবার কাছে ভীড় হয়ে যাবে। তখন আমাদের নিজেদের কাজ আর হবে হবে না।

কিন্তু সাধুবাবার কথা আর বেশিদিন চেপে রাখা গেল না। প্রথমে ভেবেছিলাম, সাধুবাবার কথা বেড়াপোতার কাউকে না জানালেই চলবে। কারণ, সাধুবাবাও তা চায় না। হিমালয়ের সাধু একটু নিরিবিলিতেই থাকতে চায়। শুধু দয়া করে বাদলের বাবার অসুখের জন্যেই বেড়াপোতায় এসেছিল সাধুবাবা। সে-অসুখ সেরে গেলেই আবার যেখানে থেকে এসেছিল, সেই হিমালয়েই চলে যাবে।

আমার কবিতা লেখার সেই উৎসাহ তখন চলে গিয়েছিল। সত্যিই তো, কী হবে কবিতা লিখে? আমার সঙ্গে কোনও পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে ভাব নেই, আর তা-ছাড়াও আমি গ্রামের ছেলে, কে আমার কবিতা ছাপিয়ে আমাকে উৎসাহ দেবে!

সেদিন হঠাৎ খবর পেলাম পদ সামন্ত'র ছেলেকে তার বাড়িতেই সাপে কামড়েছে। রাত্রে বাড়ির সামনের মাটির সামনে মাটির দাওয়ার ওপর পদ সামন্ত'র ছেলে পরমেশ সামন্ত ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, কী যেন

পায়ের কাছে কামড়াল। পা'টা চুলকোতে গিয়ে যেই হাত বাড়িয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাতেও কামড়ালো। পরমেশ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

পরমেশের চীৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। পাড়া-ময় রটে গেল খবরটা। আমরাও দৌড়তে-দৌড়তে গেলাম পদ সামন্তর বাড়িতে। দেখি, পরমেশ তখন মেঝের ওপর শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। ওঝা এসেছে। সেও তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে খুব। কত রকম যন্ত্র পড়ছে। ভিড়ে ভিড়ময় হয়ে গেছে বাড়িটা। সমস্ত বেড়াপোতা গ্রামের লোক এসে জুটেছে পদ সামন্তর উঠোনে।

ওঝা শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা করলে। অনেক মন্তর পড়লে। আর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলাম। আমাদের খুব কষ্ট হতে লাগল পরমেশের জন্যে। পরমেশ আমাদের বন্ধু। আমরা তার সঙ্গে অনেক ফুটবল খেলেছি। ইস্কুলেও এক ক্লাশে পড়ি। সে মারা যাবে, এ-কথাটা ভাবতেও আমাদের খুব খারাপ লাগল! সাপে কামড়েছিল মাঝ রাত্তিরে, আর তখন বেলা বারোটা। তখনও কিছু হল না ওঝার মন্তরে। ওঝা হাল ছেড়ে দিলে।

তখন বাদল বললে, 'আমার সাধুবাবাকে ডেকে আনব ভাই? সাধুবাবা হয়ত বাঁচাতে পারে পরমেশকে?'

বললাম, 'তাই চল্‌, সাধুবাবা নিশ্চয়ই পরমেশকে বাঁচিয়ে দেবে।'

দৌড়ে গেলাম দু'জনে সাধুবাবার কাছে। সাধুবাবা তখন চুপ-চাপ বসে ধ্যান করেছিল। আমাদের দেখে তার ধ্যান ভাঙল।

সাধুবাবা বললে, 'কী খবর? এমন? এমন অসময়ে?'

সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললাম। সাধুবাবা সব শুনে বললে, 'ঠিক আছে, তোমরা বলছো তাই যাচ্ছি! কিন্তু এরকম রোজ-রোজ আমাকে ডেকো না—এতে আমার সাধনার ক্ষতি হয়।'

বলে তৈরি হয়ে নিলে। তারপর সাধুবাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম পদ সামন্তর বাড়ি। সেখানে তখন পদ সামন্তর আত্মীয়-স্বজনের কান্না-কাটি পড়ে গেছে। পরমেশ যে মারা গেছে, সে-সম্বন্ধে আর কারো সন্দেহ নেই।

যেখানে পরমেশ অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে ছিল, সেখানে নিয়ে গেলাম সাধুবাবাকে। সাধুবাবার সেই গোঁফ-দাড়ি ভাত মুখের চেহারা, কপালে সিঁদুরের মস্ত বড় টিপ, বড়-বড় চোখ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর পায়ে খড়ম আর গেরুয়া কাপড়, খালি গা দেখে সবাই চমকে যেমন উঠেছে, তেমনি তাদের মনে আশাও জেগেছে। হয়ত এবার পরমেশ বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

পদ সামন্ত মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একে তোমরা কোথা থেকে

আনলে বাবা ?'

আমি বললাম, 'ইনি হিমালয়ের সাধুবাবা, মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বেড়াপোতায় এসেছেন—'

সাধুবাবা বললে, 'এক ঘটি কাঁচা দুধ দেখি।'

কাঁচা দুধ এক ঘটি এল। সাধুবাবা আবার বললে, 'একে ধরাধরি করে ঘরের ভেতরে নিয়ে চলো।'

আমরা দু'-তিনজন মিলে তাই করলাম। ঘরের ভেতরে একটা মাদুর পেতে তার ওপরে অজ্ঞান-অচৈতন্য পরমেশকে শুইয়ে দিলাম।

সাধুবাবা বললে, 'এবার তোমরা সবাই বাইরে যাও, আমি দরজায় খিল দিয়ে দেব। আর যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে বাইরে আসব, ততক্ষণ কেউ আমাকে বিরক্ত করবে মা। আর দরজাও ঠেলবে না।

তা সাধুবাবার কথামত তাই-ই করা হল। সাধুবাবা ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। আমরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, এক ঘণ্টা কেটে গেল। সাধুবাবা তখনও দরজা খোলে না। কিন্তু তখনও লোকে আশা করতে লাগল পরমেশ এবার নিশ্চয় বেঁচে উঠবে। তারপর যখন ঘণ্টা দু'য়েক কাটল, তখন সাধুবাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বললে, 'রোগী বেঁচে গেছে, উঠে বসেছে।'

কথাটা শুনেই হুড়-হুড় করে সব লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কে আগে ভেতরে যেতে পারবে, তারই প্রতিযোগিতা লেগে গেল। দেখা গেল সাধুবাবার কথাই সত্যি। পরমেশ তখন উঠে বসেছে মাদুরের ওপর। তাকে দেখে মনে হলো, যেন সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। সবাইকে দেখে পরমেশ বললে, 'এখানে এত লোকজন কেন ?'

সাধুবাবা সকলের চোখের আড়ালে কখন বাইরে বেরিয়ে চলে গেছে, কেউ টের পায়নি। সকলেই তার খোঁজ করতে লাগল। কোথায় গেল সাধুবাবা ? সাধুবাবা কোথায় থাকে ? তার বাড়ি কোথায় ? এত বড় গুণিন গাঁয়ে আছে, অথচ, কেউ তার হদিশ পায়নি এও একটা আজব কাণ্ড। সাধুবাবা তো টাকা-পয়সা-প্রণামী কিছুই নিলে না।

আমরা কাউকে কিছু বললাম না। কারণ, যদি সকলকে সাধুবাবার আস্তানার কথা বলি, তাহ'লে সেখানে গিয়ে সবাই ভিড় করবে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'সাধুবাবাকে তোমরা কোথা থেকে এনেছিলে ?'

সাধুবাবা কি সমস্ত রোগই সারাতে পারে ? বেড়াপোতার সকলেরই কিছু-না-কিছু পোষা রোগ আছে। কারো গেঁটে বাত, কারো অম্বল। কারো

সন্তান হয় না, কারো ছেলে পাগল—সকলেরই দরকার সাধুবাবাকে। সাধুবাবাকে দিয়ে তারা তাদের রোগ সারিয়ে নেবে।

কিন্তু কেউ সাধুবাবার কোনও পাত্তা পেল না!

আমরা দু'জন নিজেরাই সাধুবাবার অলৌকিক কাণ্ড দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা পরমেশদের বাড়ি ছেড়ে তখন নিজেদের বাড়ি চলে এলাম। বাদল বললে, 'বিকেলবেলা সাধুবাবার আড্ডায় যাব, বুঝলি? তুই রেডি থাকিস।'

বিকেলবেলার দিকে সকলের নজর এড়িয়ে আমরা সাধুবাবার আস্তানায় গেলাম। সাধুবাবা বোধহয় আমাদেরই আসার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা যেতেই সাধুবাবা বললে, 'আমার আস্তানার কথা তোমরা কাউকে বলোনি তো?'

আমরা বললাম, 'আপনি বারণ করে দিয়েছিলেন, তাই বলিনি।'

সাধুবাবা বললে, 'না, বোলো না। তাতে আমাকে বিরক্ত করবে সবাই। আমার সাধনার ক্ষতি হবে।'

আমরা বললাম, 'কিন্তু আপনার খোঁজ পেলে তাদের সকলের খুব উপকার হত সাধুবাবা। অনেক রকম অসুখ আছে, তাদের রোগ সারিয়ে দিলে তারা খুব উপকার পেত।'

সাধুবাবা বললে, 'তোমরা এখনও ছোট ছেলে তো, তাই বুঝতে পারো না, কেন আমি সকলের সঙ্গে দেখা করি না। মানুষের সুখ যেমন থাকা দরকার, তেমনি দুঃখটাও খুব দরকারী তার পক্ষে। দুঃখের মধ্যেই মানুষ নিজেকে যদি চিনতে না পারে তো, আর কোনও দিন কাউকে চিনতে পারবে না।'

আমরা সাধুবাবার কথা কিছুই সেদিন বুঝতে পারিনি।

সাধুবাবা আমাদের মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলে যে, আমরা তার কথা বুঝতে পারিনি।

আমরা বললাম, আপনি তো বাঙালী, আমরাও বাঙালী। আপনি আমাদের মত সংসারের মধ্যে না থেকে সাধু হয়ে গেলেন কেন?'

সাধুবাবা বললে, 'সে অনেক কথা। দেখ, আমাদের স্কুলের একজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তিনি আমাদের একদিন একটা গল্প বললেন। গল্পটা পৃথিবীর সৃষ্টির সময়কার। ঈশ্বর যখন আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন এখানকার জীবজন্তু, মানুষ কিছুরই সৃষ্টি হয়নি। তা প্রথমে তিনি মাত্র চাররকম জীব সৃষ্টি করলেন, মানুষ গাধা, কুকুর আর শকুন। তিনি ঠিক করলেন যে সকলেরই পরমায়ু হবে মোটামুটি চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছরের পর

আর কেউ বাঁচবে না। সবাই যখন সেই হুকুম নিয়ে চলে আসছে, তখন মানুষের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজাল।

মানুষ গাধাকে ডেকে বললে, 'ভাই গাধা, তুমি চল্লিশ বছর পরমায়ু নিয়ে কী করবে মিছিমিছি? তোমাকে তো সারাজীবন মোট বয়েই বেড়াতে হবে। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার পরমায়ু থেকে আমাকে কুড়িটা বছর দিয়ে দাও না, তাতে তুমি কুড়ি বছর মোট বওয়া থেকে রেহাই পাবে।'

গাধা দেখলে কথাটা সত্যি। কেন মিছিমিছি সে পুরো চল্লিশ বছর মোট বয়ে মরবে। তার চেয়ে যত সকাল-সকাল মুক্তি পাওয়া যায় ততোই ভাল। সে রাজী হয়ে গেল। সে নিজের কুড়ি বছর পরমায়ু দান করে দিলে মানুষকে। তাতে মানুষ নিজের পরমায়ু চল্লিশ থেকে বাড়িয়ে ষাট করে নিলে।

তারপর মানুষ কুকুরের কাছে গিয়ে সেই একই প্রস্তাব দিলে। কুকুরটা সব ভেবেচিন্তে তার পরমায়ু থেকে কুড়িটা বছর দিয়ে দিলে মানুষকে। সেও ভেবে দেখলে সত্যিই তো চল্লিশ বছর ধরে সারা রাত জেগে মনিবের বাড়ি পাহারা দেওয়া আর তার দেওয়া এঁটো-কাঁটা খাওয়ার চেয়ে সকাল-সকাল মুক্তি পাওয়াই ভাল। মানুষ তখন নিজের পরমায়ুর সঙ্গে আরো কুড়ি বছর যোগ করে নিলে। মোট পরমায়ু তার আশি বছর।

তারপরে সে গেল শকুনের কাছে। সেও সব ভেবেচিন্তে মানুষকে নিজের পরমায়ুর কুড়ি বছর দিয়ে দিলে। তখন সব মিলিয়ে মানুষের পুরো পরমায়ুর মেয়াদ দাঁড়াল একশো বছর।

অর্থাৎ মানুষের আসল জীবনের মেয়াদ হল চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে মানুষের মতই বেঁচে থাকে। তারপর চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত বাঁচে গাধার মত। তার মানে সংসারের ভার বয়ে-বয়ে বেড়ানোই তার আসল কাজ হয় তখন। ষাট থেকে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত কাটে কুকুরের মত জীবন। তখন ছেলে-মেয়ে বড় হয়, তারা বাবাকে সংসার পাহারা দেবার জন্যে বাড়িতে রেখে নিজেরা আরামে এখানে-ওখানে, দেশে-বিদেশে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। কিম্বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে। ষাট থেকে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষ তাই কুকুরের জীবনই যাপন করে। ছেলে-মেয়ে-বউ-নাতিরা তাকে খেতে দিলে, তবে সে খেতে পায়।

আর আশি বছর বয়েসের পর তখন মানুষ হয়ে যায় শকুনের মত। তখন কেউ আর তাকে দেখে না, কেউ তাকে দেখে না, কেউ তাকে ভাল করে খেতেও দেয় না। সে-যে বাড়িতে বেঁচে আছে, সে-কথাটির কারো মনে, থাকে না তখন। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে সে নিজের দাবি আদায় করতে চেষ্টা

করে সব-সময়। বাড়ির অন্য লোকদের কাছ থেকে সে তার পাওনা-গণ্ডা ছোঁ মেরে নিতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে মোটামুটি মানুষের জীবনের ইতিহাস।'

সাধুবাবা গল্প শেষ করলে। বললে, 'সেই পৃথিবীর প্রথম মানুষের ভুলের জন্যেই আমরা আজ এত কষ্ট পাচ্ছি?'

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, 'তারপর?'

সাধুবাবা বলতে লাগল, 'এই গল্পটা শুনে আমার মনের ভেতরে কী রকম একটা উৎসাহ জাগল। আমি ভাবলুম, আমি আমার জীবনটাকে অন্য লোকের মত এইভাবে হেলায় হারাতে দেব না। অত দিন যদি বাঁচি তো মানুষের মতই আমি বাঁচব। এই ভেবে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে সোজা হিমালয়ে চলে গেলুম, আর তার পর থেকে আমি সেখানেই আছি। মানুষের কল্যাণের জন্যেই মাঝে-মাঝে শুধু আমি মানুষের সমাজে আসি, তারপর একদিন হিমালয়ে চলে যাই। এই যেমন এবার এই বেড়াপোতায় এসেছি।'

গল্প শুনতে-শুনতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। সাধুবাবার তখন ধ্যানে বসবার সময়। আমরা দু'জনে চলে এলুম।

সাধুবাবা বললে, 'তোমরা কালকে আবার এসো।'

বেড়াপোতায় তখন সব লোক সাধুবাবাকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। সবাই আমাদের জিজ্ঞেস করছে, 'কোথায় গেল সেই সাধুবাবা? একবার সেই সাধুবাবার কাছে আমাদের নিয়ে চলো।'

আমরা জবাবে কিছুই বললুম না। কারণ, সাধুবাবার বারণ ছিল। একটু বেলা হবার পর আমি আর বাদল মনসাতলার ঘাটের দিকে গেলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! সাধুবাবার সেই গুহা খালি। সাধুবাবা সেখানে নেই। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু সাধুবাবা আর এল না। আমরা হতাশ হয়ে বাড়ি চলে এলাম। বুঝলাম, সাধুবাবা আবার হিমালয়ে চলে গেছে।

কিন্তু বিকেল বেলার দিকে একদল পুলিস-কনস্টেবল আমাদের সেদিন বেড়াপোতায় এসে হাজির হল। আমরা সমস্ত গাঁয়ের লোক তো পুলিস দেখে ভয়ে চমকে উঠলুম। পুলিস তো আমাদের বেড়াপোতায় বড় একটা আসে না! কী হল? বেড়াপোতায় চুরি-ডাকাতি কিছু হয়েছে নাকি?

কিন্তু না, তা নয়। দারোগাবাবু বললে, 'আমরা খবর পেয়েছি এখানে

একজন স্বদেশী-ডাকাত এই বেড়াপোতায় লুকিয়ে আছে। আমরা তাকেই খুঁজতে এসেছি। এ-গ্রামে আপনারা কেউ তাকে দেখেছেন?'

বাদল বললে, 'না, কোন স্বদেশী-ডাকাত আমাদের গ্রামে তো আসেনি।'

দারোগাবাবু বললে, 'কিন্তু কোন নতুন লোক? নতুন লোক কেউ এসেছে এখানে?'

বাদল বললে, 'না, একজন সাধুবাবা শুধু এসেছিল হিমালয় থেকে। জটাজুটধারী সাধুবাবা?'

দারোগাবাবু বললে, 'তাহ'লে ওই-ই সেই স্বদেশী-ডাকাত। সাধুবাবা সেজে এখানে লুকিয়ে ছিল তার বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারের ওয়ারেণ্ট আছে।'

বাদল বললে, কিন্তু সাধুবাবা তো আবার হিমালয়ে চলে গেছে।'

দারোগাবাবু বললে, 'আসলে ডাকাতটা হিমালয়ে চলে যায়নি, নিশ্চয় বেড়াপোতার কাছাকাছি কোনও জায়গায় লুকিয়ে আছে। ওই স্বদেশী-ডাকাতটাই লাটসাহেবকে গুলি করে খুন করেছে। তাই তাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'



ছোটবেলাকার বড় গল্প

ছোটবেলায় আমি অন্য ছেলেদের মতোই গল্প শুনতে ভালবাসতুম। তা সে ছোটগল্পই হোক, আর বড় গল্পই হোক। পিসিমা বা ঠাকুমা দু'জনকেই আমি 'গল্প বলো' বলে বিরক্ত করতাম। গল্প শুনতে-শুনতে অনেক সময়ই ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের দিন ঘুম ভাঙতেই দৌড়ে গিয়েছি ঠাকুরমার কাছে। জিজ্ঞেস করেছি—তারপর কী হল ঠাকুমা? দুয়োরানীর শেষকালে কী হল?

ঠাকুমা বলত—ও, মনে পড়েছে। কোন্ পর্যন্ত বলেছিলুম তোকে?

আমি মনে করিয়ে দিতাম। ঠাকুমা বলত—রাত্তিরবেলা আবার বলবো। এখন কাজের সময়—

আমি বারবার জ্বালাতন করতাম—না, এখুনি বলতে হবে, রাত্তিরে নয়—

ঠাকুমা বলত—এখন সংসারের কাজকর্ম দেখবো, না তোর সঙ্গে গল্প করব। এখন দেখছিস নে হাতে কত কাজ রয়েছে। তোর বাবাকে এখুনি অফিসের ভাত দিতে হবে!

কিন্তু রাত আসতে তখন অনেক দেরি। রাত যেন তখন আর আসতে চাইত না। মনে হত এক ঘণ্টায় দিন হলে যেন ভাল হত! চব্বিশ ঘণ্টাকে তখন চব্বিশ বছর বলে মনে হত! মনে আছে, যে বেশ ভাল গল্প বলতে পারত তখন, তাকেই আমার ভাল লাগত।

একবার মা-বাবা গুরুদেব আমাদের বাড়িতে এলেন। গুরুদেবকে দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। বাবা-মা-ঠাকুমা সবাই তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুরুদেবের সেবা তো সোজা কথা নয়। গুরুদেবের জন্যে ভাল-ভাল মিষ্টি এল বাড়িতে, লুচি ভাজা হতে লাগল। দুধ-দই-রাবড়িও এল। বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ নেমে এল। কত বছর পরে গুরুদেব এলেন, মা আর বাবা আর আমার ঠাকুমার যেন আনন্দের সীমা নেই। কিসে গুরুদেব খুশী হবেন, কী খেয়ে তিনি তৃপ্তি পাবেন, কেবল সেই-ই ভাবনা তাদের।

আমি সে-কদিন বড় নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। আমাকে গল্প শোনাবার আর কেউই নেই তখন। আমি তবু ঠাকুমাকে বলতাম—কই, গল্প বলো ঠাকুমা!

ঠাকুমা বলত—না, এখন গল্প বলবার সময় নেই, দেখছিস নে বাড়িতে গুরুদেব এসেছেন, এখন কি গল্প বলবার ফুরসত আছে ?

তা সত্যি, গুরুদেব রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আমাকে গল্প শোনাবার আর সময় হতো না কারো। আর আমিও ভাবতুম কবে গুরুদেব চলে যাবেন, তখন সকলের হাড় জুড়োবে।

শেষকালে একদিন শুনলাম, গুরুদেব এবার চলে যাবেন। শুনে আমার খুব আনন্দ হল। এবার বাড়ি ঠাণ্ডা হবে। আবার আগেকার মতন ঠাকুমার কাছে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গল্প শুনতে পারব।

সেদিন গুরুদেবের যাবার দিন। গুরুদেব বাড়িতে এসেছেন শুনে ক'দিন ধরেই পাড়ার লোকেরা এসে তাঁর উপদেশ শুনতো। শেষ দিনে ভীড়টা বাড়ল। কারণ, এমন সুযোগ আর আসবে না বহুদিন। আবার তিনি কবে আসেন তার তো ঠিক নেই।

সকলের সঙ্গে আমিও ঘরের এককোণে বসে ছিলাম।

একজন শিষ্য বললেন, 'গুরুদেব, আজ আমাদের কিছু বলুন। এমন কিছু বলুন যা শুনে আমরা চিরকাল মনে রাখতে পারব।'

গুরুদেব পশমের আসনের ওপর বসে ছিলেন যোগাসন হয়ে। বললেন, 'এত দিন তো কেবল উপদেশ দিয়ে এসেছি, আজ একটা গল্প শোনাব।'

সবাই গলবস্ত্র হয়ে গুরুদেবের সামনে বসলো। গুরুদেবের মুখে সেদিন যে গল্প শুনেছিলাম, তা আমার মনে আছে। এ-গল্প আমি জীবনে ভুলব না এ সুয়োরানী-দুয়োরানী গল্প-নয়, এ রাক্ষস-খোক্কস বা চারু-হারুর গল্প নয়, এ একেবারে জাগ্রত জীবনের গল্প। যতদিন বেঁচে থাকব, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ-গল্প আমার মনে থাকবে। যতই বড় হচ্ছি, ততই এ-গল্পের মানে ভাল করে বুঝতে পারছি। গুরুদেব বলতে আরম্ভ করলেন।

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার মন্ত্রী, সহচর, যুবরাজ, পারিষদেরাও সবাই চারপাশে সভা আলো করে বসে আছেন। একে-একে প্রজারা আসছে। আর রাজা তাদের নিবেদন শুনছেন। কেউ বলছে তার অভাবের কথা। রাজা মন্ত্রীকে কিছু টাকা দিতে বলছেন তাকে।

মন্ত্রী টাকা দিতেই লোকটা প্রণাম করে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

তারপর আর-একজন এলো। বললে, 'আমায় কিছু জমি দিন মহারাজ, আমি চাষবাষ করবো।"

মহারাজা মন্ত্রীকে জমি দেবার হুকুম দিলেন লোকটাকে।

মন্ত্রীমশাই একটা পাট্টা লিখে দিতেই লোকটা চলে গেল।

এর পর আর-একজন প্রজা এল। এসে বলল, 'আমি কিছু চাই না মহারাজ। আমি একটা কবিতা লিখেছি। সেইটে পড়ে শোনাবো।'

এই বলে লোকটা কবিতা পড়ে শোনাতে লাগল।

কবিতা শোনা হয়ে গেলে মহারাজা বললেন, 'সাধু-সাধু—'

তারপর মন্ত্রীকে বললেন কবিকে একটা মোহর দিতে।

মোহর নিয়ে লোকটা বিদায় নিলে। এই রকম নানা প্রজার নানা চাহিদা মেটালেন মহারাজা। মহারাজা প্রতি বছর তাঁর নিজের জন্মদিনে এই উৎসব করেন। যে-যা চায়, তাকে তিনি তাই দেন।

একবার অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে এক জাদুকর এল।

মহারাজা যথারীতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী চাই?'

জাদুকর বললে, 'আমি একজন জাদুকর, আমি আপনাকে আমার খেলা দেখাতে চাই।'

'কী খেলা দেখাবে?'

'আপনি কী খেলা দেখবেন বলুন? আমি এমন খেলা দেখাতে পারি যাতে আপনি চমকে উঠবেন, আবার আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

মহারাজা বললেন, 'তাহ'লে দেখাও তোমার খেলা—'

মহারাজার কথা বলা শেষ হওয়ার আগেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সিংহাসন সুদ্ধ মহারাজা উড়তে লাগলেন। উড়তে-উড়তে প্রাসাদ পেরিয়ে একেবারে মহাকাশে উড়তে লাগলেন। দেখলেন, চারিদিকে গ্রহ-তারকারা ঘুরছে। তিনিও তাঁর সিংহাসনে বসে তাদের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরছেন বটে কিন্তু কেন যে ঘুরছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। ভাবতে চেষ্টা করলেন তিনি কে, কেন তিনি ঘুরছেন, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না তাঁর। বড় খিদে পেতে লাগল। কিন্তু কোথায় খাওয়ার মতো কিছুই দেখতে পেলেন

না, একটু জলের চিহ্নও কোথাও নজরে পড়ল না তার। তাহ'লে তিনি কী করে বাঁচবেন! আর তাছাড়া কেউ কোথাও নেই, কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারলে বুক ফেটে যাচ্ছে। সিংহাসনটা গ্রহ-তারকার সঙ্গে বনবন করতে-করতে ঘুরছে। তিনি চেঁচাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বেরোল না।

তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—আমি কে?

কিন্তু কেউ তার সে-কথার জবাব দিলে না। তিনি যেন নিজেকেই চিনতে পারলেন না। বারবার চেষ্টা করেও যখন তার প্রশ্নের কোনও জবাব পেলাম না, তখন ভাগ্যের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে সিংহাসনটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলেন। আর সিংহাসনটা ঝড়ের বেগে উড়ে চলল।

দিন গড়িয়ে রাত হল, রাত গড়িয়ে দিন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। তিনি তখন পাগলের মতো হয়ে গেলেন। এমনি উড়তে-উড়তে একদিন তিনি এক জঙ্গলের মধ্যে এসে নামলেন। আর সিংহাসনটা উড়ে কোথায় চলে গেল তাঁকে নামিয়ে দিয়ে।

তিনি তখন খিদে-তেষ্টায় অস্থির। আশেপাশে কোনও নদী, পুকুর বা হ্রদ দেখতে পেলেন না যে, তা থেকে তিনি একটু জল খেয়ে তেষ্টা মেটান। কিম্বা এমন কোনও ফলের গাছও দেখতে না যে তার ফল খেয়ে তিনি খিদে পাওয়ার অভাব মেটাতে পারেন।

তাছাড়া তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। বনে বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-জন্তু জানোয়ার কত কী থাকতে পারে। তারাও তাঁকে কামড়ে দিতে পারে। তাঁর খুব ভয় করতে লাগল। হঠাৎ দূরে একজন মানুষের মতো একটা চেহারা দেখে তাঁর আশা হলো। মানুষের দেখা যখন তিনি পেয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লোকজনের বসতি আছে। তিনি চেঁচিয়ে তাকে ডাকলেন। বললেন, "কে ওখান দিয়ে যায়? কে গো তুমি, কে?'

কথা শুনে মানুষটা কাছে এল। তার হাতে একটা মরা পাখি। মস্ত বড় পাখি। মহারাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?'

লোকটা বললে, 'আমি একজন ব্যাধ। বনের পশুপাখি মেরে জীবন চালাই। আজ আমরা এটাকে রান্না করে খাব।'

মহারাজা তখন বললেন, 'আমি অনেকদিন কিছু খাইনি। আজকে আমাকে একটু কিছু খেতে দেবে?'

ব্যাধ জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কে?'

মহারাজা বললেন, 'তা-তো জানি না, আমার কিছুই মনে নেই। আমি

আমার নিজের নামটাও ভুলে গিয়েছি—'

ব্যাধটা বললে, 'খেতে দিতে পারি, কিন্তু একটা কথা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি খুব বড়লোকের ঘরের ছেলে। আমাদের মতন গরীব নন। আপনার গায়ের জামা-কাপড় দেখে মনে হয়, আপনি পথ ভুলে এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন।'

মহারাজ বললেন, 'তা হয়তো হবে, কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ছে না—আমার খিদের জ্বালায় পেট চোঁ-চোঁ করছে, আর আমার কিছু জানা নেই—'

ব্যাধটা বললে, 'একটা কাজ করলে খেতে দিতে পারি—'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ, বলো!'

ব্যাধ বললে, 'তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হও, তাহ'লে তোমাকে খেতে দিতে পারি।'

মহারাজা বললেন, 'তা বিয়ে করবো! কোথায় তোমার মেয়ে?'

ব্যাধটা বললে, 'আমার বাড়িতে। তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে চলো—'

মহারাজা রাজী হয়ে গেলেন। রাজী হওয়া ছাড়া আর তাঁর কোনও গতিও ছিল না। ব্যাধটা তখন বাড়ির দিকে চলতে লাগল, আর মহারাজও চলতে লাগলেন তার পেছন-পেছন।

সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়ে গেল। চারদিক থেকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের হাঁক-ডাকের আওয়াজ আসছে। অনেক দূরে প্রায় মাইল-দু'য়েক হেঁটে একটা নদীর ধারে ব্যাধের বাড়ি। ব্যাধ বাড়িতে আসতেই ব্যাধের মেয়ে দৌড়ে বাইরে এল। বাইরে বাবার সঙ্গে আর একজন নতুন মানুষ দেখে কেমন আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যাধের মেয়ে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তারপর হাসতে-হাসতে বললে, 'এ-যে খুব বড়লোক বাবা, এ আমার মতো গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে কেন?'

ব্যাধ বললে, 'করবে রে করবে! এ আমাকে কথা দিয়েছে। একে খেতে দিলে এ তোকে বিয়ে করবে!'

'কী খেতে দিলে?'

ব্যাধ বললে, 'এই যে পাখি মেরে এনেছি। এটা তুই এক্ষুনি রান্না করে দে। এটা খেয়ে নিলে তারপর তোদের বিয়ে হবে।'

মহারাজা বললে, 'রান্না করতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, ঘরে আর কি আছে?'

ব্যাধের মেয়েটাকে বললে, 'হ্যাঁ, আচার আছে, খাবে?'

মহারাজ বললে, 'হ্যাঁ, আমি সব খাবো। আমি অনেক দিন কিছু খাইনি,

না, একটু জলের চিহ্নও কোথাও নজরে পড়ল না তার। তাহ'লে তিনি কী করে বাঁচবেন! আর তাছাড়া কেউ কোথাও নেই, কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারলে বুক ফেটে যাচ্ছে। সিংহাসনটা গ্রহ-তারকার সঙ্গে বনবন করতে-করতে ঘুরছে। তিনি চেঁচাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বেরোল না।

তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—আমি কে?

কিন্তু কেউ তার সে-কথার জবাব দিলে না। তিনি যেন নিজেকেই চিনতে পারলেন না। বারবার চেষ্টা করেও যখন তার প্রশ্নের কোনও জবাব পেলাম না, তখন ভাগ্যের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে সিংহাসনটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলেন। আর সিংহাসনটা ঝড়ের বেগে উড়ে চলল্।

দিন গড়িয়ে রাত হল, রাত গড়িয়ে দিন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। তিনি তখন পাগলের মতো হয়ে গেলেন। এমনি উড়তে-উড়তে একদিন তিনি এক জঙ্গলের মধ্যে এসে নামলেন। আর সিংহাসনটা উড়ে কোথায় চলে গেল তাঁকে নামিয়ে দিয়ে।

তিনি তখন খিদে-তেষ্টায় অস্থির। আশেপাশে কোনও নদী, পুকুর বা হ্রদ দেখতে পেলেন না যে, তা থেকে তিনি একটু জল খেয়ে তেষ্টা মেটান। কিম্বা এমন কোনও ফলের গাছও দেখতে না যে তার ফল খেয়ে তিনি খিদে পাওয়ার অভাব মেটাতে পারেন।

তাছাড়া তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। বনে বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-জন্তু জানোয়ার কত কী থাকতে পারে। তারাও তাঁকে কামড়ে দিতে পারে। তাঁর খুব ভয় করতে লাগল। হঠাৎ দূরে একজন মানুষের মতো একটা চেহারা দেখে তাঁর আশা হলো। মানুষের দেখা যখন তিনি পেয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লোকজনের বসতি আছে। তিনি চেঁচিয়ে তাকে ডাকলেন। বললেন, "কে ওখান দিয়ে যায়? কে গো তুমি, কে?'

কথা শুনে মানুষটা কাছে এল। তার হাতে একটা মরা পাখি। মস্ত বড় পাখি। মহারাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?'

লোকটা বললে, 'আমি একজন ব্যাধ। বনের পশুপাখি মেরে জীবন চালাই। আজ আমরা এটাকে রান্না করে খাব।'

মহারাজা তখন বললেন, 'আমি অনেকদিন কিছু খাইনি। আজকে আমাকে একটু কিছু খেতে দেবে?'

ব্যাধ জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কে?'

মহারাজা বললেন, 'তা-তো জানি না, আমার কিছুই মনে নেই। আমি

আমার নিজের নামটাও ভুলে গিয়েছি—'

ব্যাধটা বললে, 'খেতে দিতে পারি, কিন্তু একটা কথা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি খুব বড়লোকের ঘরের ছেলে। আমাদের মতন গরীব নন। আপনার গায়ের জামা-কাপড় দেখে মনে হয়, আপনি পথ ভুলে এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন।'

মহারাজ বললেন, 'তা হয়তো হবে, কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ছে না—আমার খিদের জ্বালায় পেট চোঁ-চোঁ করছে, আর আমার কিছু জানা নেই—'

ব্যাধটা বললে, 'একটা কাজ করলে খেতে দিতে পারি—'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ, বলো!'

ব্যাধ বললে, 'তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হও, তাহ'লে তোমাকে খেতে দিতে পারি।'

মহারাজা বললেন, 'তা বিয়ে করবো! কোথায় তোমার মেয়ে?'

ব্যাধটা বললে, 'আমার বাড়িতে। তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে চলো—'

মহারাজা রাজী হয়ে গেলেন। রাজী হওয়া ছাড়া আর তাঁর কোনও গতিও ছিল না। ব্যাধটা তখন বাড়ির দিকে চলতে লাগল, আর মহারাজও চলতে লাগলেন তার পেছন-পেছন।

সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়ে গেল। চারদিক থেকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের হাঁক-ডাকের আওয়াজ আসছে। অনেক দূরে প্রায় মাইল-দু'য়েক হেঁটে একটা নদীর ধারে ব্যাধের বাড়ি। ব্যাধ বাড়িতে আসতেই ব্যাধের মেয়ে দৌড়ে বাইরে এল। বাইরে বাবার সঙ্গে আর একজন নতুন মানুষ দেখে কেমন আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যাধের মেয়ে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তারপর হাসতে-হাসতে বললে, 'এ-যে খুব বড়লোক বাবা, এ আমার মতো গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে কেন?'

ব্যাধ বললে, 'করবে রে করবে! এ আমাকে কথা দিয়েছে। একে খেতে দিলে এ তোকে বিয়ে করবে!'

'কী খেতে দিলে?'

ব্যাধ বললে, 'এই যে পাখি মেরে এনেছি। এটা তুই এক্ষুনি রান্না করে দে। এটা খেয়ে নিলে তারপর তোদের বিয়ে হবে।'

মহারাজা বললে, 'রান্না করতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, ঘরে আর কি আছে?'

ব্যাধের মেয়েটাকে বললে, 'হ্যাঁ, আচার আছে, খাবে?'

মহারাজ বললে, 'হ্যাঁ, আমি সব খাবো। আমি অনেক দিন কিছু খাইনি,

তার আগে আমাকে একটু খাবার জল দাও—'

ব্যাধের মেয়েটা ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা জলের কলসী নিয়ে এলো। মহারাজ দু'হাত জড়ো করে পাতলেন।

ব্যাধের মেয়েটা দু'হাতের পাতার মধ্যে জল ফেলতে লাগল, আর মহারাজা চোঁ-চোঁ করে সব জল খেয়ে ফেললেন। কলসীর জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা জিজ্ঞেস করলে, 'আরো জল খাবে?'

মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, এখনও তেষ্টা মেটেনি—'

ব্যাধের মেয়েটা তখন আরও একটা জল-ভর্তি কলসী নিয়ে এল। সেটাও ঢালতে লাগল মহারাজের দু'হাতের তেলোর ওপর। প্রায় আধকলসী জল খেয়ে মহারাজার যেন ধরে প্রাণ ফিরে এল। তারপর শিকার করা পাখিগুলো কেটে-কুটে রান্না করা হল। ব্যাধের মেয়েটিই রান্নাবান্না করলে। তারপর ভাত রান্নাবান্না করলে। তারপর ভাত রান্না হল।

ব্যাধটা মহারাজাকে ডেকে বললে, 'এসো, খেতে এসো বাবাজী।'

মহারাজার তখন আর দেরী সইছিল না। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি সব ভাত ক'টা খেয়ে নিলেন। বললেন, 'আর দু'টি ভাত দাও—'

ব্যাধের মেয়ে বললে, 'আর তো ভাত নেই, তাহ'লে আবার আমাকে ভাত চড়াতে হবে।'

ব্যাধও বললে, 'তাই চড়া। পেট না ভরলে মানুষ কখন খেয়ে তৃপ্তি পায়? আধপেটা খেয়ে কখনও মানুষ থাকতে পারে?'

সত্যিই আবার আরো ভাত রান্না হল। খাওয়ার মধ্যে কতটুকু আর তরকারি। মাংস আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। শুধু ভাত একটু নুন মেখে গিলে ফেলা। কতদিন খাননি মহারাজা, তাই সে শুধু-ভাতই মহারাজের মুখে অমৃতের মতো লাগলো।

তার পরদিন থেকে মহারাজের সঙ্গে ব্যাধের মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। গ্রামের সমস্ত ব্যাধ সেদিন জঙ্গলের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে একগাদা খরগোস আর পাখি মেরে নিয়ে এল।

বিয়ের দিন ভোজ হবে। অনেক ভাত রান্না হয়েছে, অনেক মাংস। বিয়ে হবার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই মিলে দলে-দলে নাচতে লাগল। সে নাচ চললো অনেক রাত পর্যন্ত। ব্যাধেদের গ্রামে একজনের বাড়িতে বিয়ে হলে সকলের নেমন্তন্ন থাকে। বড় আনন্দে কাটল দিনটি।

ব্যাধ-ব্যাধিনী সবাই বললে, খুব ভাল হয়েছে জামাই।

তার পরদিন থেকে ব্যাধদের জীবন আবার আগেকার মতো চলতে

লাগল। নদীর ধারে পলিমাটি-জমা জমিতে সবাই নিজেদের মধ্যে জায়গা ভাগ করে নিয়ে চাষ করতে গেল। লাঙল দিয়ে বিঘের পর বিঘে জমি চাষ করা হল। তারপর এল বর্ষাকাল।

যে-সব গাছ-গাছালি গরমকালে শুকিয়ে গিয়েছিল, সেই সব গাছে আবার সবুজ পাতা গজিয়ে উঠতে লাগল। মহারাজের খুব আনন্দ। ব্যাধদেরও খুব আনন্দ। সারাদিন ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে ক্ষেতে কাজকরা, কিম্বা খরগোস বা পশু শিকার করা, রাতের বেলা বাড়িতে এসে দল বেঁধে ঢোল বাজিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কোমর ধরে-ধরে গান করা আর নাচা। মহারাজার তখন খুব সুখেই দিন কাটতে লাগল।

ব্যাধের জামাই বলে অন্য সব ব্যাধেরাও মহারাজাকে খুব ভাল-বাসতে লাগল। মহারাজার মনে হলো, এতদিন পরে তিনি যেন পুনর্জন্ম পেয়েছেন। বর্ষা কেটে গেলে শরৎকাল আসে। তারপর আসে হেমন্ত, আর তারপর শীতকাল। বর্ষাকালে নদী থেকে মাছ ধরা। আর শীতকালে জানোয়ারের চামড়ার জামা পরে রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে শরীর গরম করা।

এমনিই চলছিল মহারাজার জীবন। তিনি যে একদিক এর চেয়েও আরামে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর যে অনেক টাকা, তাঁর যে অনেক সৈন্য-সামন্ত, পাইক পেয়াদা ছিল, সে-সব তখন আর কিছুই নেই।

কয়েক বছর পরে তাঁর দু'টো ছেলে হল।

ছেলে দু'টিকে দেখতে ঠিক বাপের মতন সুন্দর।

কিন্তু একটানা সুখ কোনও মানুষের জীবনেই চিরস্থায়ী হয় না। মহারাজা বেশ মনের আনন্দেই সে-দেশে কাটাচ্ছিলেন।

সকালবেলা ব্যাধেদের সঙ্গে শিকারে বেরোতেন। আর বাড়িতে ব্যাধের স্ত্রী সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সংসারের কাজ কি কম ছিল নাকি। সমস্ত বাড়িটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা, ছেলে দু'টোকে স্নান করানো, খাওয়ানো, তাদের তীরধনুক নিয়ে খেলানো।

কারণ বড় হয়ে তারা তো আবার ব্যাধ হবে! ছোটবেলা থেকে তাদের তীরধনুকের খেলা শিখতে হয়। এ ব্যাধেদের পাড়ার সব ছেলেদের নিয়ম। পাড়ায় আরো অনেক ব্যাধ থাকে। তাদের ছেলে-মেয়েরা থাকে। এক সঙ্গে সবাই খেলা করে। তারাও বড় হয়ে ব্যাধ হবে।

মহারাজাও ভোরবেলা তীরধনুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে যান। কোথায় কোন্ পাখি, কোথায় কোন্ বুনোশুয়োর, কোথায় কোন্ ঘুঘু পাখি, মুরগি, খরগোস, এই সব খুঁজে-খুঁজে মেরে আনাই ব্যাধেদের কাজ।

সেই জানোয়ার-পাখি-পশু যখন মেরে বাড়িতে আসেন মহারাজা, তখন আর ছেলেদের আনন্দ ধরে না।

তারা সেদিন পেট ভরে পেলে আর কিছু চায় না। বউও খুব খুশি হয়।

শ্বশুর আগেই মারা গিয়েছিল। এক মেয়ে ছাড়া শ্বশুরের আর কেউ ছিল না। তাই শ্বশুর মারা যাবার পর তারা সংসারে মাত্র চারজন প্রাণী ছিল। স্বামী-স্ত্রী আর দু'টো ছেলে।

মহারাজার মনেও খুন আনন্দ! মেয়ে নেই, যে বিয়ে দিতে হবে তার। ছেলে দু'টো বড় হলে তারাই তখন শিকার করে বাপ-মাকে খাওয়াবে!

এক-একদিন মহারাজা শহরে চলে যেতেন। শহর থেকে নুন, তেল, দেশলাই আরো কত কী খুঁটি-নাঁটি কিনতে হত। শুধু তো আর শিকার করলেই পেট ভরে না রান্না করবার কাঠও কেটে আনতেন!

তারপর আছে কাপড়। একখানা করে দু'জনে পরতেন। তবু তার জন্যেও টাকা-পয়সার দরকার। সেই টাকা-পয়সা উপায় করবার জন্যে মাথায় করে কাঠ বয়ে নিয়ে যেতেন বাজারে।

তা বাজার কি কাছে, যে কাঠ বিক্রি টাকা উপায় করবেন আর বাড়ি চলে আসবেন। মাঝরাত্রে বাড়ি থেকে বেরোলে, তবে পরের বিকালবেলা শহরের হাটে পৌঁছাবেন। সেখানে সমস্ত রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলার হাটে সেই কাঠ বেচবেন। সেই কাঠবেচা টাকা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করবেন। আর পথও তো কম নয়। বিশ-তিরিশ মাইল তো হবেই। অত ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে অতখানি রাস্তা চলতে সমস্ত শরীর ব্যাথায় টনটন করত। মাঝে-মাঝে মাথার বোঝাটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতেন। তারপর কাউকে বলে সেটা মাথায় তুলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করতেন।

মহারাজার তো জীবনে এসব অভ্যেস ছিল না। কিন্তু মনেও ছিল না আগেকার জীবনের কথা। কেবল মনে হতো কী করে সংসার চালাবেন। কী করে বউ-ছেলেদের পেট ভরে খেতে দিতে পারবেন!

তা এমনি করে কোথা দিয়ে দিন-মাস আর বছরগুলো কেটে যাচ্ছিল, তার খেয়াল ছিল না কারো। ছেলেরা আস্তে-আস্তে বড় হচ্ছিল। তারাও বাপের সঙ্গে মাঝে-মাঝে শিকারে যেতে লাগল।

মহারাজাও খুশী। কারণ ছেলেরা বড় হয়ে গেলে তাঁকে আর বেশি খাটতে হবে না। তখন তারাই খাটা-খাটুনি করবে আর তিনি বুড়ো হয়ে বসে-বসে খাবেন। কিন্তু হায় রে মানুষ, আর হায় রে মানুষের আশা!

হঠাৎ একবছর বর্ষা হল না। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই, বর্ষাকালে সবাই হাঁ করে

দিন-রাত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। নদীর জল শুকিয়ে এল। একেবারে সরু সুতোর মতো। যে-সব পাখির জল খেতে দূর-দূর থেকে উড়ে আসত, তাদের আর দেখা পাওয়া গেল না। জল খেতে না পেলে তারাই বা ওখানে আসবে কেন? তাদের পাখা আছে, সেই পাখার সাহায্যে উড়তে-উড়তে তারা অন্য দেশে উড়ে গেল, যেখানে জল আছে, যেখানে খাবার আছে।

তারপর বনের পশুরাও কোথায় চলে গেল নিঃশব্দে! খরগোস নেই, বুনো শুয়োর নেই, শেয়াল নেই একটা, বনে আর কত জানোয়ার থাকে, তারাও সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মহারাজা তীর-ধনুক-বর্শা দিয়ে শিকার করতে যান, আর খালি হাতে ফিরে আসেন। বউ জিজ্ঞেস করলে, 'আজকে খালি হাতে ফিরে এলে যে? কিছু পেলে না?'

মহারাজ হতাশ হয়ে দাওয়ার ওপর বসে বললেন, 'না—'

ছেলেরা সারাদিন বাপের জন্য অপেক্ষা করছিল। বললে, 'বাবা, আজকে কী খাব?'

মহারাজা বললেন, 'আজকের রাতটা কোনোরকমে উপোস করে থাকো বাবা, কাল সকালবেলা আবার কিছু শিকার করে আনতে চেষ্টা করবো—'

ছেলেরা সেকথা বুঝবে কেন? তারা যুক্তি বোঝে না, খেতে চায়।

মহারাজা তাদের বুঝিয়ে বলেন, 'তোরা আমার সঙ্গে চল্, দেখে আসবি চল্ নিজের চোখে। একটা যদি কিছু দেখতে পাস্ তো তখন আমায় বলবি!'

ছেলেরা বিশ্বাস করে না। বলে, 'তাই কখনও হয়?'

মহারাজা বলেন, 'হয়-হয়, নইলে আমাদের পাড়ায় এত ব্যাধ ছিল, তারা সব কী খাচ্ছে? তারাও সব আমাদের মতন কিছুই খাচ্ছে না, না খেয়ে মরে যাচ্ছে। কত লোক গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পাড়া একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে। যারা এখনও যায় নি, তারাও চলে যাবো-যাবো করছে—'

ছেলেরা বললে, 'তাহ'লে তুমিও গাঁ ছেড়ে চলে চলো। যেখানে গিয়ে খেতে পাব, সেখানেই আমরা যাব—'

বউ বললে, 'ওগো, তবে তাই-ই চলো। কতদিনে এ দুর্ভিক্ষ কাটবে কে জানে। আমরাই বা কতদিন না খেয়ে থাকব?'

মহারাজা বললেন, 'তবে তাই-ই চলো। শহরে গিয়ে আমরা আর কিছু না করতে পারি, ভিক্ষে করে পেট চালাব।'

একদিন বউ আর ছেলেদের নিয়ে মহারাজা ঘর ছেড়ে বেরোলেন। আর এখানে ফিরবেন না। যতদিন বৃষ্টি না হয়, নদীতে খালে-বিলে জল না আসে, ততদিন তিনি ভিক্ষে করেই সকলকে খাওয়াবেন।

রাত থাকতেই সবাই রাস্তায় বেরোল। সঙ্গে নিয়ে যাবার কিছুই নেই। শুধু তীর-ধনুক আর বর্শাটা রইলো সঙ্গে। পথে যদি কিছু পাওয়া যায় শিকার করে খাবেন। সঙ্গে একটা দেশলাইও নিলেন।

কিন্তু পথ খাঁ-খাঁ করছে। যতদূর অন্ধকারে দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই। পাড়ার ব্যাধেরা অনেকদিন আগে চলে গেছে। তখন তাদের সঙ্গে গেলেই ভাল হতো, কিন্তু তাঁর আশা ছিল বৃষ্টি আসবে।

ক্রমে ভোর হল। গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লোকে সেই গাছের পাতাগুলো আগুনে সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলেছে। অনেক গাছে একটা পাতাও নেই। শুধু শুকনো ডালগুলো মুখ হাঁ করে বোবার মতন তাকিয়ে আছে। ছেলে বললে, 'বাবা, শহর আর কতদূর ?

মহারাজা বললেন, 'আর বেশি দূর নয়, কাল সকালবেলাই আমরা শহরে পৌঁছে যাব।'

কিন্তু তাদের শরীরে তখন আর শক্তি নেই। তারা সেখানেই বসে পড়ল। বললে, 'আমরা আর হাঁটতে পারছি না, আমাদের কাঁধে তুলে নাও—'

মহারাজাও অনেকদিন কিছু খান নি, শরীরে আর জোর নেই। তবু ছেলেদের কাঁধে তুলে নিলেন।

কিন্তু খানিক দূরে গিয়ে তাঁরও পা ব্যথা করতে লাগল। তিনি আর চলতে পারছিলেন না। তাঁর বউ তখন অনেক পেছনে পড়ে আছে। তিনি পেছনে চেয়ে দেখলেন বউও বোধহয় আর হাঁটতে পারছে না।

বউকে ডাকলেন, 'কই, তুমি এসো—'

বউ বললে, 'আমি এখানে একটু বসি। আর হাঁটতে পারছি না।'

বউকে আর তিনি কী বলবেন। তাকে তো আর তিনি কাঁধে তুলে নিতে পারেন না। তাঁর দু' কাঁধে তো দুই ছেলে রয়েছে।

তিনি বললেন, 'ওরে, তোরা আমার কাঁধ থেকে নাম। আমিও আর চলতে পারছি না—'

অন্ধকার রাত। সকলেরই ঘুম পেয়েছিল। ছেলেরা মহারাজের কাঁধ থেকে নামল। নেমে মাটির ওপরেই শুয়ে পড়ল। তিনিও শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো তিনি বোধহয় এবার মারা যাবেন। কিন্তু ছেলে বউ কারোরই ঘুম এল না।

ঘুম আসবে কী করে ? পেটে জ্বলন্ত খিদে থাকলে কি ঘুম আসে ?

এক ছেলে বললে, 'বাবা, বড্ড খিদে পেয়েছে—'

আর-একটা ছেলেও বললে, 'বাবা, আমারও বড় খিদে পেয়েছে।'

বউ কিছু বললে না বটে মুখে, কিন্তু তার দিকে চেয়ে মনে হলো, তারও খুব খিদে পেয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে বললে, 'বাবা, আর পারছি না, তুমি মরো, আমরা তোমায় পুড়িয়ে খাই।

মহারাজা ছোট ছেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, তোরও কি তাই মত?'

ছোট ছেলে বললে, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি মরো, আমরা তোমাকে পুড়িয়ে খাই। তবু তো আমাদের পেট ভরবে।'

মহারাজা অবাক হয়ে গেলেন ছেলেদের কথা শুনে। যে-ছেলেদের তিনি এত কষ্ট করে মানুষ করেছেন, সেই ছেলেরাই তাঁর মরণ কামনা করছে। খিদে কি তাহ'লে এতই নিষ্ঠুর জিনিস? নিজের বাপকেও কি তাহ'লে তারা ভালবাসে না? তাহ'লে কেন তিনি সংসারের জন্যে এত করেছিলেন? তাহ'লে সংসারকে তিনি কেন এত ভালবেসেছিলেন? তাহ'লে কার জন্যে তিনি দিনরাত এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতেন? ওরা তো তাঁর নিজেরই ছেলে? নিজের ছেলেদের ভালবাসা কি তাহ'লে পাপ? না, এই-ই সংসারের নিয়ম।

বউকে মহারাজা ডাকলেন। বউও ক্ষিদের জ্বালায় আর পরিশ্রমে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। মহারাজা বললেন, 'আমার বড় ছেলে কী বলছে জানো?'

'কী?'

'বলছে আমি মরি আর ও আমাকে পুড়িয়ে আমার মাংস খাবে, আমার ছোট ছেলেও সেই একই কথা বলছে—'

বউ বললে, 'তুমি কেন পুড়ে মরতে যাবে? তার চেয়ে আমি পুড়ে মরি, ওরা আমার মাংস খাক—'

মহারাজা বললেন, 'না, তা হয় না। ওরা এখনও ছোট, তুমি মারা গেলে ওদের কে দেখবে? তার চেয়ে আমি মরি—'

বউ বললে, 'না, তা হয় না, আমি মরবো।'

মহারাজা বললেন, 'না, তা কিছুতেই হতে দেব না, আমিই মরবো—'

বলে মহারাজা কাঠকুটো জোগাড় করতে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন 'অনেক কাঠ লাগবে, তাই একটু দেরি হতে পারে, তুমি কিছু ভেবো না।'

মহারাজ কাঠ জোগাড় করতে গেলেন।

আশে-পাশের সব গাছের ডালপাতাই শুকিয়ে খড়মড়ে হয়ে গেছে। একবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালেই সেগুলো জ্বলে উঠবে।

তিনি গাছে উঠে গাছের ডালপালা জড়ো করতে লগলেন। যখন অনেক জড়ো হলো, তখন তিনি সেগুলো নিয়ে এসে সেখানে পাহাড় করে রাখলেন।

কাঠের গাদায় আগুন ধরালেন মহারাজা। তারপর ছেলেদের বললেন, 'এই আমি আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছি, আমি যন্ত্রণায় ছটফট করলেও তোমরা কেউ আমাকে বাঁচিও না। আমি যতক্ষণ না পুড়ে মরি, ততক্ষণ কেউ তোমরা আমায় রেহাই দিও না। তারপর যখন একেবারে পুড়ে যাব, তখন তোমরা পেট ভরে আমার মাংস খেও—'

আর বউকে বললেন, 'তোমারও খুব ক্ষিদে পেয়েছে জানি, আমার জন্যে ভেবো না, তুমিও পোড়া মাংস খেও'—বলে মহারাজা আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজার বউও আগুনের ওপর ঝাঁপ দিলেন।

এদিকে রাজসভায় তখন অনেক লোকের ভিড়। মহারাজা মূর্ছা গেছেন। কবিরাজ-বৈদ্যর কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল। তিনি একটা ওষুধ দিয়ে মহারাজার মূর্ছা ভাঙালেন।

মহারাজা চারিদিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ আমি কোথায়?'

মন্ত্রী বললে, 'আপনি মূর্ছা গিয়েছিলেন মহারাজ। রাজবৈদ্য এসে আপনার মূর্ছা ভাঙিয়েছেন, আপনি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আর কোনও ভয় নেই—'

মহারাজা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আমার ছেলেরা?'

মন্ত্রী বললেন, 'যুবরাজেরা তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজা। আপনি মূর্ছা যাওয়াতেই তাঁরাও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন!'

তখন মহারাজার সব কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো, সেই জাদুকরের কথা। কোথায় গেল সেই জাদুকর?

গল্প থামালেন গুরুদেব। আমরা সবাই গল্প শুনছিলাম। গল্প শেষ করে গুরুদেব বললেন, 'এই-ই হল সংসার। এ সবই মায়া, এই স্বামী-পুত্র-পরিবার ঐশ্বর্য-সম্পদ যা-কিছু দেখছো সবই জাদুকরের খেলা।'

———



নীলমণি একটি ভাল্লুক

দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস কোম্পানী দার্জিলিং শহরে তাঁবু গেড়েছে। কিন্তু কিন্তু দলের মালিকের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। অন্যবারের মত এবারে তেমন টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। সবাই বলছে 'এবার নীলমণি নেই। সুতরাং সার্কাস দেখে লাভ কী?'

নীলমণি নেই বলে রামলালেরও কোনও কাজ নেই। সে-ই ছিল নীলমণির ট্রেনার। সে নেই বলে রামলালেরও মন খারাপ।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হুড়মুড় করে নীলমণি এসে ঢুকলো গেটের মধ্যে দিয়ে। রামলাল চমকে উঠলো—'নীলমণি তুই এতদিন কোথায় ছিলি?'

নীলমণি যে কোথায় ছিল, তা সে বললে। সে অনেক কথা, সেই নীলমণির কথাটাই এখানে আরো বলি।

সার্কাস-পার্টির স্পেশ্যাল ট্রেনটা যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই কাণ্ডটা ঘটে। ট্রেনটাতে হঠাৎ আগুন লেগেছিল সেদিন। তখন থেকে নীলমণিকে পাওয়া যায় নি। সেই নীলমণি এতদিন পরে ফিরে এসেছে।

এর ক'দিন আগেকার ঘটনা। রাত বোধহয় তখন অনেক। ভেতর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না কিছু। শুধু চাকাগুলোয় ঘড়-ঘড় আওয়াজ কানে আসছিল। মনে হচ্ছিল, গাড়ীটা গড়িয়ে-গড়িয়ে উঁচু দিকে কোথাও যাচ্ছে। ভেতরে আর যারা ছিল তারা বেশ ঘুমোচ্ছে।

এমনিতেই নীলমণির পাতলা ঘুম, তার ওপর রাত্রের ট্রেন। ট্রেনের দুলুনি আছে। অত দুলুনি হলে কি ঘুমোন যায়?

সারাজীবন নীলমণিকে ট্রেনে চড়ে এদেশ থেকে ওদেশে যেতে হয়েছে। এক-এক জায়গায় চার দিন কি পাঁচ দিনের বেশী কোথাও থাকার নিয়ম নেই তাদের। চার-পাঁচ দিন কোথাও থাকলো, তো যথেষ্ট। তারপর আবার জিনিসপত্র গোছাও, বাক্স-বিছানা বাঁধো, আর তারপর ট্রেনে গিয়ে ওঠো।

তা রামলাল লোকটা ভালো। যা কিছু খেলা নীলমণি শিখেছে, সবই ওই রামলালের কাছ থেকে। মুখটা আকাশের দিকে উঁচু করে নাকের ওপর একট বল্ বসিয়ে পেছনে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে নাচতে হয়, তা শিখিয়েছিল ওই রামলাল। আর একটা খেলা শিখিয়েছিল রামলাল। পেছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে দু' হাতে চারটে বল্ নিয়ে লোফালুফি করা—তাও শিখিয়েছিল রামলালই। নীলমণির খেলা দেখতে বড় ভালবাসতো ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা। তার খেলা দেখবার জন্যেই সবাই সার্কাসের টিকিট কাটতো। রামলালই তার নাম দিয়েছিল 'নীলমণি'। ওই সমস্ত কথাই বসে-বসে ভাবছিল নীলমণি, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে খুব আগুনের হল্‌কা আসতে লাগলো গায়ে, আর ধোঁয়ার গন্ধ লাগলো নাকে। আগুন কোথা থেকে এলো?

হঠাৎ ট্রেনটা থেমে গেল একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে। আর সেই হ্যাঁচ্‌কা টানে নীলমণি গাড়ির ভেতরই চিৎপাত হয়ে গেল। এমন তো কখনও হয় না। হলোটা কী?

আর কিছু ভাববার আগেই আগুনের লকলকে শিখা এসে ঢুকলো তাদের কামরায়। কামরার ভেতরে আরও অনেকে ছিল। তারাও চমকে উঠেছে। তারাও সবাই বলতে লাগলো—ট্রেনে আগুন লেগেছে, ট্রেনে আগুন লেগেছে।

বাইরে আগুন আর ভেতরে ধোঁয়া। তারপরে ট্রেনটা কাত হয়ে হেলে পড়লো। তার সঙ্গে চেন্ দিয়ে বাঁধা দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল।

নীলমণি সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। ট্রেনে সার্কাস কোম্পানীর যে সব লোক যাচ্ছিল, তারা তখন এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। কী করবে তা সে বুঝতে পারছে

না। আশে-পাশে জঙ্গল। একেবারে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তা জগতের কেউই জানতে পারলে না। শুধু ট্রেনের গার্ড-ড্রাইভার আর খালাসীরা চারিদিকে দৌড়ো-দৌড়ি করছে। হয়তো সামনের স্টেশনে কেউ খবর দিতে দৌড়ে গেছে। এখনই হয়তো সেখান থেকে লোকজন এসে যাবে তাদের উদ্ধার করতে। আর রামলাল যদি একবার দেখতে পায়, তো তাকে হয়তো ধরে ফেলবে।

তার চেয়ে এখান থেকে পালানোই ভালো। এই-ই সুযোগ। এ-সুযোগ হাতছাড়া হলে আর দ্বিতীয় বার এমন সুযোগ আসবে না।

নীলমণি এক লাফে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

কবে ছোটবেলায় একদিন একটা ব্যাধ তাকে ধরে ফেলেছিল। তখন তার বয়েস কতো আর? তিন মাস কি চার মাস হবে। সে তখন কিছুই বুঝতো না। মা'র সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে ঘুরতো সব সময়।

মা বলতো—খুব সাবধান, আমার সঙ্গে-সঙ্গে সব সময় থাকবি। আমি যেখানে যাবো, সেখানে যাবি। একলা কোথাও যাবি না।

নীলমণি তখন ছোট, কিছু বুঝতো না। জিজ্ঞেস করতো—কেন মা, একলা কোথাও যাবো না কেন?

নীলমণির মা বলতো—একলা কোথাও গেলেই মানুষেরা ধরে নেবে—

নীলমণি জিজ্ঞেস করতো—মানুষ কী মা?

নীলমণির মা বলতো—মানুষ খুব বদমাইস্ জন্তু। মানুষই আমাদের শত্রু। মানুষ আমাদের দেখলেই ধরে নিয়ে যাবে—

—ধরে নিয়ে কোথায় যাবে?

নীলমণির মা বলতো—ধরে নিয়ে বাড়িতে লোহার খাঁচায় পুরে রেখে দেবে—

—খাঁচায় পুরে কী করবে?

মা বলতো—খাঁচায় পুরে পেট ভরে খেতে দেবে না। খুব মারবে। গরম লোহা দিয়ে পোষ মানাবার জন্যে গাঁয়ে ছ্যাঁকা দেবে—

নীলমণি তখন ভেবে পেতো না, কেন মানুষ ভালুককে ধরে নিয়ে গিয়ে লোহার খাঁচায় পুরবে। তাতে মানুষের কী লাভ? বাড়িতে ভালুক পুষে রেখেই বা তাদের লাভ কী? ভালুকেরা মানুষের কী ক্ষতি করেছে, যে মানুষেরা তাদের এত শাস্তি দেবে?

মা বলতো—মানুষের স্বভাবই এই। কেউ তার ক্ষতি করুক আর না-করুক, সে সকলের ক্ষতি করে। ওইজন্যেই তো বলি, মানুষ খুব খারাপ জন্তু—

নীলমণি জিজ্ঞেস করতো—মানুষ কোথায় থাকে মা ?

মা বলতো—শহরে-গাঁয়ে মানুষ থাকে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তীর-ধনুক বন্দুক-টন্দুক নিয়ে আমাদের ধরতে আসে। এখানে এসে বাঘ ধরে, হরিণ ধরে, বাঁদর ধরে, ভালুক ধরে। তাই তো বলছিলুম, আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হলো মানুষ। তাই মানুষকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলেই আমরা পালিয়ে যাই। মানুষ বড় খারাপ জন্তু।

একদিন মা যা ভয় করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো।

নীলমণি একদিন মা'র সঙ্গে বনে বেড়াচ্ছে। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সারাদিন পেট ভরে খেয়ে তারা দু'জনে ঘুরতে বেরিয়েছে। শেষকালে মা বললে—চল্, এবার নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসি। জল খেয়ে তার পরে বাড়ি যাবো—

নীলমণিরও জলতেষ্টা পেয়েছিল। সেও মা'র সঙ্গে চলতে লাগলো। জঙ্গলটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানটা দিয়েই নদীটা বয়ে গেছে। তর-তর করছে নদীর জল। নদীতে নেমে নীলমণি যেই জলে মুখ দিয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছড়ানো জাল এসে মাথায় পড়েছে।

মা চমকে উঠেই দৌড় দিয়েছে, আর চেঁচিয়ে উঠেছে—পালিয়ে আয় খোকা, পালিয়ে আয়, জাল ছিঁড়ে পালিয়ে আয়—

মা'র গায়ে খুব জোর ছিল। মা নীলমণির চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তাই মা জাল ছিঁড়ে পালাতে পারলো। কিন্তু নীলমণি পালাতে পারলে না। পালাতে চেষ্টা করতে গিয়ে জালের দড়িতে আরো বেশী করে আটকে গেল। শেষকালে কয়েকজন লোক লাঠি-সোটা নিয়ে এসে নীলমণিকে খুব মারতে লাগলো। মেরে-মেরে তারা নীলমণিকে প্রায় আধমরা করে ফেললে!

নীলমণি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মা'কে ডাকতে লাগলো—মা, ও মা—মা—

কিন্তু কোথায় মা। আশে-পাশে দূরে কাছে কোথাও মা'কে দেখতে পেলে না সে। নীলমণি ধরা পড়েছে শুনে কাছাকাছি গ্রাম থেকে লোকজন ছেলে-মেয়ে সবাই দৌড়ে এল। সবাই তাকে হাঁ করে দেখতে লাগলো। আর সবাই বলতে লাগলো—কত বড় ভালুক—দেখবি আয়—

সবাই কাঠি দিয়ে তার গায়ে খোঁচা দিতে লাগলো। যারা নীলমণিকে ধরেছিল, তারা তাড়িয়ে দিলে সবাইকে। বললে—যাও সবাই চলে যাও এখান থেকে—যাও—চলে যাও—

তারপর নীলমণিকে একটা খাঁচায় পুরলো তারা। আর তারপর খাঁচাসুদ্ধ তাকে তুললো একটা নৌকোতে। নীলমণি চেয়ে দেখতে লাগলো।

চারদিকে নদীর দুই তীরে কাতারে-কাতারে লোক জমেছে। তাকে দেখবার জন্যে। সমস্ত রাত নৌকোটা নদীতে ভেসে চললো। নীলমণির মনে মনে পড়তে লাগলো মা'র কথাগুলো। মা বলেছিল 'মানুষেরা বড় খারাপ জন্তু। তারা ভালুকদের ধরে লোহার খাঁচায় পুরে পোষ মানাবে'।

সেই যে নৌকোর ওপরে তারা তাকে খাঁচাসুদ্ধ তুলেছিল, তারপর তাকে তারা কোথায় কাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিলে। টাকা নিয়ে তাদের দর-দস্তুর হলো। এরা বললে—আমাদের সাতশো টাকা চাই—

তারা বললে—পাঁচশো টাকার বেশী এক পয়সা দেব না—

নীলমণি হাঁ করে তাদের কথা শুনতে লাগলো। সবাই ভালো করে তার দিকে চেয়ে যাচাই করে দেখতে লাগলো, দরটা কম হলো না বেশী হলো। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো দু'দলের মধ্যে। যারা তাকে কিনলো, তারা একটা লরি ভাড়া করে তাতে তাকে তুলে নিয়ে গেল তাদের আস্তানায়।

সে-আস্তানাটা একটা মাঠের মধ্যে। নীলমণি সেখানে গিয়ে দেখলে আরো অনেক জন্তু আছে সেখানে। বাঘ আছে, সিংহ আছে, উট আছে, ঘোড়া আছে। আরো কত রকমের জন্তু রয়েছে সেখানে। সবাইকেই তারা বন থেকে ধরে এনেছে। সেখানেই রামলালবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা।

রামলাল তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে—কী রে, যা-যা খেলা শেখাবো, তা তুই শিখতে পারবি তো?

নীলমণি আর তার কী জবাব দেবে। কিছুই জবাব দিতে পারলে না, চুপ করে রইলো শুধু।

তার পরদিন থেকে নীলমণিকে খেলা শেখানো শুরু হলো।

আসলে অনেক পরে সে জানতে পারলে ওটা একটা সার্কাস কোম্পানী। তাদের কাজ হলো দল-বল নিয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়ানো আর খেলা দেখানো। কখনও কলকাতা, কখনও দার্জিলিং, কখনও লখনৌ, কানপুর, রায়বেরিলি। আবার কখনও দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ। খুব দেশ-বিদেশ ঘুরে নিয়েছে সে। বলতে গেলে রামলালের জন্যেই তার যা-কিছু খাতির।

রামলাল তাকে অনেক খেলা শিখিয়েছিল। পেছনের দুই পাশের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নাকের ওপর একটা সরু লাঠি দাঁড় করিয়ে দিত। রামলাল সে-খেলাটাকে বলতো—ব্যালেন্স খেলা—

আরো অনেক ব্যালেন্স-খেলা শিখেছিল নীলমণি। দু'টো বল নিয়ে লোফালুফি খেলা, একটা বিরাট বলের ওপর দাঁড়িয়ে বলটাকে গড়াতে-গড়াতে একবার সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া, আর তারপর আবার বলটাকে পেছনের

দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

নীলমণি বনের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে এই সব কথাই ভাবছিল। যাক্, এতদিনে রামলালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। তাকে এখান থেকে কেউ আর হুকুম করবে না। তাকেও আর রামলালের হুকুম তামিল করতে হবে না এখন থেকে। এখন থেকে সে স্বাধীন।

আস্তে-আস্তে ভোর হয়ে এল। মনে আছে, ছোটবেলায় ঠিক এই সময়েই মা তাকে নিয়ে জঙ্গলে চরতে বেরোত। কোথায় জল পাওয়া যায়, কোথায় খাবার পাওয়া যায়, সে-সব খবর মা'র মুখস্থ ছিল। মা এক-একদিন এক-এক জঙ্গলে নিয়ে যেত তাকে। সেখানে গিয়ে মা নিজেও খেত, তাকেও খাওয়াতো। মা বলতো—যখন তুই খাবি, তখন কিন্তু তোর চারদিকে নজর রাখবি। দেখবি চেয়ে-চেয়ে, মানুষেরা তোকে ধরতে আসছে কিনা—

যত খুশী যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। নদীর ধারেই বেশী ভয়। এখানে নদীও নেই, ভয়ও নেই। নীলমণি বেশ আরাম করে বেড়াতে লাগলো। হঠাৎ মনে পড়লো আগেকার দিনগুলোর কথা। অন্য দিন হলে এই সকাল-বেলা রামলাল খাঁচার সামনে এসে তাকে খাবার দিয়ে যেতো।

বলতো—খা-খা নীলমণি, খা—

খাঁচার মধ্যে থাকলে খাওয়ার ভাবনা থাকে না। ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ঘড়ি দেখে সে খাওয়া পেত। আজ এত খানি বেলা হলো, অথচ তার কিছু খাওয়া জুটলো না। তার পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগলো ক্ষিদের জ্বালায়। অত দিনকার ঘড়ি ধরে খাওয়ার অভ্যেস, সব এই প্রথম বানচাল হয়ে গেল।

চলতে-চলতে হঠাৎ দেখলে দূরে একদল হরিণ চরছে। তারাও খেতে বেরিয়েছে। তারাও তো তারই মত জংলী জীব। বলতে গেলে স্বজাতি। তাদের দিকেই এগিয়ে গেল নীলমণি!

নীলমণি দূর থেকে তাদের দিকে চেয়ে ডাকলে—এই তোমরা শোন—

তারা কান খাড়া করে দাঁড়ালো। নীলমণি বললে—আমি ভাই এতদিন সার্কাস পার্টিতে ছিলুম, এখন ছাড়া পেয়েছি, বলতে পারো তোমরা এখানে আমাদের ভালুকের দলটা কোন্ দিকে?

বলতে-বলতে নীলমণি তাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে হরিণের দলটা চোখের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীলমণি তাদের ব্যবহার দেখে মনে বড় কষ্ট পেলে। মানুষের দলে সে এতদিন ছিল বলে কি এমন করে আজ নীলমণি সকলের পর হয়ে গেল? নাকি ওরা নীলমণিকে দেখে ভয় পেলে? কে জানে?

জঙ্গলের মধ্যে গাছের পাতায়-পাতায়, ডালে-ডালে ঘষাঘষিতে কেমন একটা শির-শির শব্দ হচ্ছিল। আগেও এ শব্দটা শুনেছে সে। সেই ছোট-বেলায় এই শব্দ শুনে সে খুব ভয় পেত। কিন্তু এখন জেনেছে, ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

রোদে ভরে গেল জঙ্গলটা। একটা শেয়াল সামনে দিয়ে যেতে-যেতে তাকে দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে পথের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেন যে তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে সবাই, তা সে বুঝতে পারলে না। তাকে দেখে আগে তো ভয় পেত না কেউ। মানুষের দলে সে মিশে যে কী দোষ করেছে, তাও সে বুঝতে পারলে না। গাছের ডালে একটা পাখি কুক্-কুক্ করে ডেকে উঠলো।

নীলমণি মুখটা উঁচু করে দেখলে। ভারী সুন্দর দেখতে পাখিটাকে।

নীলমণি পাখিটাকে লক্ষ্য করেই বলতে লাগলো—কী রে, চিনতে পারিস আমাকে? বলতে পারিস আমার মা কোথায়?

পাখিটা কথাগুলো বুঝলো কিনা কে জানে, সে নীলমণিকে কিছু জবাব না দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

নীলমণি মনে-মনে বলতে লাগলো—দূর ছাই, এই ক'দিনের মধ্যে দেখছি পৃথিবীটা একেবারে বদলে গেল। আগে তো এমন ছিল না। আগে তো সবাই তাকে কত ভালোবাসতো! আগে তো ডাকলে সবাই তার সঙ্গে ভাব করতো, তার সঙ্গে কথা বলতো। এই ক'টা বছরের মধ্যেই এরা এমন বদলে গেল?

এমন কি, জঙ্গলটাও যেন আর সে-রকম আগেকার জঙ্গল নেই। অনেক ফাঁকা-ফাঁকা। গাছগুলো যেন আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। অনেক গাছ কাঠুরেরা কুড়ুল দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে। জঙ্গল যেন এখন পাতলা হয়ে গেছে অনেক। ওই দিকটার কোণে অনেক ফুলগাছ ছিল। তখন কত ফুল ফুটতো ওখানে। এখন সেখানে শুধু কাঁটা গাছ দেখা যাচ্ছে! এমন হলো কেন?

এমনি করেই সমস্ত দুপুরটা ঘুরতে লাগলো নীলমণি। তার পা ব্যথা করতে লাগলো। এত তো হাঁটার অভ্যেস নেই অনেক দিন। না হেঁটে-হেঁটে এমন হয়েছে, যে এখন একটু হাঁটলেই পা ব্যথা করে।

অথচ সে তো এখন স্বাধীন! তার তো শরীরে আরো শক্তি আসা উচিত এখন। এখন আর রামলালের চাবুকের ভয় নেই। এখন সারা দিন, সারা রাত সে ঘুমিয়েও কাটাতে পারে। তাকে কারো কিছু বলবার অধিকার নেই।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। এইবার সব জন্তু-জানোয়াররা বাইরে বেরোবে।

নীলমণি আরো অনেক দূরে চলতে লাগলো হেঁটে-হেঁটে। একটা নেকড়ে বাঘ তাকে গ্রাহ্য না করেই পাশ দিয়ে চলে গেল। একটু ভ্রূক্ষেপও করলে না তাকে। যেন সে জন্তুই নয়, একটা গাছ কি একটা পাথর।

হঠাৎ নীলমণি দেখলে দূরে একদল ভাল্লুক। তারই স্বজাতি! সে চীৎকার করে ডেকে উঠলো—এই ভাই সব, শোন,-শোন—

তারা তার ডাক শুনে দাঁড়িয়ে গেল। নীলমণি দৌড়তে লাগলো তাদের ধরবার জন্যে।

দৌড়তে-দৌড়তে বলতে লাগলো—আমি মানুষের কাছ থেকে তোমাদের কাছে পালিয়ে এসেছি ভাই, এই দেখো, আমার গলায় এখম আর শেকল নেই, আমার নাকেও আর দড়ি নেই—আমি একেবারে স্বাধীন—

তারা তাকে দেখে প্রথমে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীলমণি যত কাছাকাছি আসতে লাগলো, তারাও ততো পিছু হটতে লাগলো—

নীলমণি বলতে লাগলো—তোমরা আমাকে দেখে পালাচ্ছ কেন ভাই? ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি তোমাদেরই স্বজাতি। আমি তো এই জঙ্গলে তোমাদের মতই মানুষ হয়েছি, আমি তো তোমাদের মত এই জঙ্গলেই এক-কালে জন্মেছি। মানুষ আমাকে জালপেতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই আমি এতদিন শহরে ছিলুম। এখন আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি ভাই, তোমরা কাছে এসো, আমার কথাগুলো একবার শোন—

ভাল্লুকের দল একবার থম্‌কে দাঁড়ালো তার কথা শুনে।

নীলমণি এক কাণ্ড করলো তখন। পাশ থেকে একটা লম্বা কাঠি যোগাড় করে নিয়ে নিজের নাকের ওপর রেখে পেছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। তারপর রামলালের কাছে শেখা তার সেই 'ব্যালেন্স-খেলা'টা দেখাতে লাগলো। দূরে ভালুকের দল তা দেখে আরো ঘাবড়ে গেল।

নীলমণি ভাবলে, তারা বুঝি নীলমণির 'ব্যালেন্স-খেলা' দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি দু'টো পাথরের ঢ্যালা নিয়ে দুই হাতে লোফালুফি করতে লাগলো। দেখো, মানুষদের কাছ থেকে কত খেলা শিখে এসেছি।

মুখে সে বললে—আমি এ-রকম আরো অনেক খেলা জানি ভাই, সব খেলা আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব, তোমরা আমার কাছে এসো। আমার মা কোথায় আছে আমাকে বলে দাও, আমি মা'র কাছে যাবো—

এবার আর ভাল্লুকগুলো দাঁড়ালো না। তারা নীলমণির কাণ্ড দেখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা করলে না। ভাবলে ভাল্লুকটা হয়তো মানুষের চর, মিষ্টি কথা বলে তাদেরও ধরতে এসেছে। ডাইনী-বিদ্যে দিয়ে তাদের

সব পাকড়াও করবে।

চোখের পলকে তারা যে যেদিকে পারলে ছুটে পালিয়ে গেল।

নীলমণির চোখ দিয়ে তখন কান্না বেরিয়ে এল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। একে খাওয়া নেই, তার ওপর হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত, সে সেখানেই হতাশায়-বেদনায়-ক্ষুধায় কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

সেদিন সার্কাস শুরু হতে চলেছে। শহরের মধ্যে তাঁবু খাটানো হয়েছে। বাইরে আলো জ্বলছে অনেকগুলো। আলোয় একেবারে আলো হয়ে গেছে জায়গাটা। হঠাৎ সকলে ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছে। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আচম্‌কা একটা ভালুক দেখে যে যেদিকে পারলে পালিয়ে গেল। গেট পাহারা দিচ্ছিল বাহাদুর। সে চিনতে পেরেছে ঠিক।

বললে—আরে, আমাদের নীলমণি না?

কিন্তু নীলমণির তখন আর কোনও দিকে নজর নাই। সে হুড়মুড় করে গেটের পর্দা ঠেলে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

রামলালের কাছে খবর গেল। সে খবরটা পেয়েই দৌড়ে এসেছে। আনন্দে তখন সে একেবারে আত্মহারা।

সে নীলমণির গলাটা জড়িয়ে ধরলে। বললে—তুই এলি নীলমণি? তুই আমাকে বাঁচালি। তোর জন্যে আমার চাকরি চলে যেতে বসেছিল রে।

নীলমণিও রামলালকে দেখে খুব খুশী। সে বললে—আমি এলুম রামলালবাবু, আমার স্বজাতিরা আমাকে নিলে না, তারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে। তাই তোমাদের কাছেই আমি আবার ফিরে এলুম, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে রামলালবাবু, আমাকে এখুনি কিছু খেতে দিন—

রামলাল নীলমণির ভাষা কিছু বুঝতে পারলে না। শুধু এইটুকু বুঝলে, যে নীলমণি জাত ভাইদের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়েই আবার এখানে এখানে ফিরে এসেছে। রামলাল নীলমণিকে খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে আর কখনও পালাবি না তো?

নীলমণি এক পেট জল খেয়ে বললে—না রামলালবাবু, আত্মীয়-স্বজনের কাছে জীবনে আর কখনও যাবো না, আত্মীয়-স্বজনেরা নিজেদের মধ্যে কারো ভালো দেখতে পারে না, আমার কাছে পরই ভালো—

———



সূর্য্যি ডুবুরি

আমরা বলতাম সূর্য্যি-কানা। কিন্তু আসলে ছিল ডুবুরী। ব্যাপারীরা বলতো সূর্য্যি ডুবুরী। নবাবগঞ্জের ঘাটে যে-সব দশ-মণি, বিশ-মণি নৌকো আসতো, মাঝি-মাল্লারা দরকার পড়লেই ডেকে পাঠাতো সূর্য্যি ডুবুরিকে।

সূর্য্যি-কানা নেশাখোর লোক ছিল। সহজে তাকে দিয়ে কাজ করানো যেত না। কিন্তু একবার ধরে-বেঁধে কাজে নামাতে পারলে, তখন তার জুড়ি মেলা ছিল ভার। কারো নৌকো ,ডুবেছে শুনলেই প্রথমে গাঁই-গুঁই করতো। বলতো—আমি এখন পারবো নি, আমার শরীর খারাপ—

কিন্তু তেমন করে গাঁজা খাওয়ার লোভ দেখাতে পারলে কোমরে গামছা বেঁধে কাজে নেমে পড়তো ? সারা গায়ে সরষের তেল মেখে বেশ করে লেঙট পরে জলে নেমে পড়তো।

সূর্য্যি-কানা নামবে শুনলে আমরাও গঙ্গার ধারে গিয়ে ভিড় করতাম। দেখতাম সূর্যি কানার সে কী খাতির। তখন বড়-বড় মহাজনেরা সূর্য্যি-কানাকে খোসামোদ করতে ব্যস্ত। সূর্য্যি-কানা জলে ডুব দিয়ে জলের তলার নেমে মালের হদিস করবে, দেখবে নৌকোটা জলে কত তলায় আছে, কী অবস্থায় আছে, নৌকোর মাল ঠিক- ঠিক আছে কি না, এই সব। সূর্য্যি-কানা জল থেকে উঠে এসে যদি রিপোর্ট দেয় যে সব ঠিক আছে, তখন নৌকো ওঠাবার ব্যবস্থা করবে। নৌকোতে যদি ধান থাকে কি চাল থাকে, তা ডাঙায় ওঠাবার

ব্যবস্থা করবে। তখন সূর্য্যি-কানাই আবার তাদের সাহায্য করবে।

তা এই সূর্য্যি-কানাই সেবার কাজকর্ম হঠাৎ ছেড়ে দিলো।

সেবার পূর্বস্থলীর হরিমোহন সামন্ত'র হাজার-মণি নৌকো ধান বোঝাই হয়ে আসছিল নবাবগঞ্জের ঘাটে। ঘাটে পৌঁছোবার আগেই যখন ঠিক মাঝ-গঙ্গায় মোড় ঘুরেছে, তখনই নৌকোটা ডুবতে আরম্ভ করলো। হাজার চেষ্টা করেও কেউ আর তাকে ঠেকাতে পারলে না। সূর্য্যি-ডুবুরীর ডাক পড়ল।

অনেক খোসামোদ করার পর সূর্য্যি-কানা রাজী হলো জলে নামতে। জলে নামলো যখন তখন বেলা বারোটা, কিন্তু একটা বাজলো, দু'টো বাজলো, তিনটে বাজলো, তবু ওঠে না। কান্না-কাটি পড়ে গেল নবাবগঞ্জের ঘাটে। সূর্য্যি-কানার বউ এল। সেও কাঁদতে লাগলো। হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো স্বামীর শোকে। এক মহামারী কাণ্ড বেধে গেল ঘাটের ওপর।

শেষকালে সূর্য্যির সাক্‌রেদ গণশা বাউরি এলো। গণশাও গায়ে তেল মেখে জলে নেমে পড়লো। সাঁতার কেটে গঙ্গার মাঝ-বরাবর গিয়ে ডুব দিলে। আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম ডাঙার ওপর। পূর্বস্থলীর হরিমোহন সামন্ত আড়ত্‌দার লোক। প্রচুর টাকার মালিক। তারও খুব হয়রানি হতে লাগলো। তার আমলা-কর্মচারীদের ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই। তারাও হাঁ করে সেই দিকে দিকে চেয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরেগণশা বাউরি সাঁতরে ওপরে উঠে এল। বললে—না গো, পেলাম না—

—পেলাম না মানে?

হরিমোহন সামন্ত মশাই বুঝতে পারলে না। বললে—কী, পেলে না?

—আজ্ঞে ওস্তাদও নেই, আপনার নৌকোও নেই, সব স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছে—

আবার কান্নাকাটি পড়ে গেল ঘাটে। এতদিনের সূর্য্যি-কানা তবে কি মারা গেল নাকি? সবাই যখন মহা ভাবনায় অস্থির হয়ে আছে, তখন, হঠাৎ সূর্য্যি-কানা জল থেকে ভুশ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সবাই সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কী গো সূর্য্যি-কানা? হলো কি? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? নৌকোর হদ্দিস পেলে?

সূর্য্যি-কানা তখন ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে। তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তখন তাড়াতাড়ি সবাই মিলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কথা বলবার ক্ষমতাও নেই তার।

সেই দিন থেকেই সেই সূর্য্যি-কানা ডুবুরীর কাজ ছেড়ে দিলে। আর কোনদিন সে জলে ডোবেনি তারপর থেকে।

এ সেই সূর্য্যি-কানা'রই গল্প। তখন অনেক বয়েস হয়ে গেছে সূর্য্যি-কানার। নবাবগঞ্জের ঘাটে তখন আর তেমন মহাজনী-নৌকো আসে না। ধান-চালের কারবার উঠে গেছে নবাবগঞ্জের হাট থেকে। রেলগাড়িতে চাল আসে, গম আসে। কোথা থেকে আসে, কেউ জানে না। লোকে বলে আমেরিকা-রাশিয়া, আবার কেউ-কেউ বলে অন্ধ্র, কিংবা উড়িষ্যা থেকে।

আসলে সরকার দয়া করে চাল দেয় রেশনে। নিক্তিতে মেপে- মেপে সেই চালই লোকে রান্না করে খায়। পূর্বস্থলীর অত বড় আড়তদার হরিমোহন সামন্ত'র নাম এখন আর শোনা যায় না কারো মুখে। এখন একেবারে যুগ পালটে গেছে।

আমাদের এখন বেশ বয়েস। কিন্তু সূর্য্যি-কানা বেশ অথর্ব মানুষ। একদিন ধরলাম গিয়ে সূর্য্যি-কানাকে। বললাম—কী গো সূর্য্যি, কেমন আছ?

সূর্য্যি-কানা দুঃখের কথা বলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাকে চেপে ধরে বসলাম। একটা বিড়ি দিয়ে আদর-আপ্যায়ন করলাম। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হতে লাগলো। সেই সব আগেকার দিনের কথা উঠলো। সে-সব কত সুখের দিন ছিল। হরিমোহন সামন্তর কথা উঠলো। নবাবগঞ্জের ঘাটের কথাও উঠলো। বুড়ো কত কী দেখেছে, কত কী ভোগ করেছে, কত কী শোক পেয়েছে, তার কথাও বলতে লাগলো।

শেষকালে হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম—আচ্ছা সূর্য্যি, তোমার সেই সেবারের জলে ডোবার কথাটা মনে আছে।

—কোনবারের কথা?

—সেই যে হরিমোহন সামন্ত'র হাজার-মণি ধানের নৌকো মাঝ-গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিল, তারপর তোমার ডাক পড়লো! তুমি বেলা বারোটার সময় জলে ডুবলে, আর বিকেল তিনটের পর্যন্ত আর তোমার দেখা নেই। আমরা ভাবলুম তুমি বুঝি মারা গেছো। তারপর এক সময়ে ভুশ করে ভেসে উঠলে?

মনে-পড়ে, সূর্য্যি-কানার মুখটা আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো।

বললাম —আচ্ছা বলো তো সূর্য্যি, তারপর থেকে আর জলে নামতে না কেন? কী হলো তোমার?

প্রথমে কিছুতেই বলতে রাজী হয় না সূর্য্যি-কানা। শেষকালে অনেক ধরাধরির পর সূর্য্যি-কানা বললে—সে এক কাণ্ড হয়েছিল বাবু, আমি কাউকে বলিনি—সে এক গুহ্য কথা।

—কী গুহ্য কথা তোমাকে বলতেই হবে সূর্য্যি। বলতেই হবে, তুমি আর একটা বিড়ি খাও—না বললে তোমাকে আজ আমি ছাড়ছি না—

মনে আছে, সেদিন সেই সামান্য অশিক্ষিত সূয্যি-ডুবুরির কাছে যে-কাহিনী শুনেছিলাম, তা আজও ভুলতে পারিনি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, লৌকিক-অলৌকিকের প্রশ্নও নয়। প্রশ্ন হলো—এ কী করে সম্ভব ?

তা সম্ভব হোক আর না-ই হোক, আমি সেদিন সূযি্য-কানা'র কাছে যে-গল্প শুনেছিলাম, তা আজ লিখে যাচ্ছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

সূর্য্যি-কানা নাকের নিশ্বাস বন্ধ করে নীচে নামতেই দেখলে নৌকো-টৌকো কিছুই নেই। তার ভেতর একটা বিরাট প্রাসাদ। জলের ভেতর এতবার নেমেছে সূর্য্যি কিন্তু কখনও এ-প্রাসাদ দেখেনি।

প্রাসাদটা দেখে সূর্য্যি অবাক হয়ে গেল। সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলে চার-মহলা বাড়ি। এ-মহল থেকে ও-মহল হয়ে একেবারে অন্দর-মহলে ঢুকতেই একজনের গলা শোনা গেল—কে ?

সূর্য্যি চারিদিকে খুঁজে দেখলে ঘরটার এক কোণে একটা বুড়ো থুথ্‌ড়ো মানুষ বসে-বসে তামাক খাচ্ছে।

তামাক খাওয়া থামিয়ে লোকটা আবার হাঁকলে—কে তুমি ?

সূয্যি বললে—আজ্ঞে, আমি সূর্য্যি-কানা।

—সূর্য্যি-কানা মানে ?

সূর্য্যি বললে—মানে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকলে আমি কিছু দেখতে পাইনে বলে আমাকে সবাই সূর্য্যি-কানা বলে। আসলে আমি ডুবুরী, এখানে পূর্ব-স্থলীয় হরিমোহন সামন্তের চালের নৌকা ডুবে গেছে বলে দেখতে এসেছি—

লোকটা বললে—চালের নৌকা-টৌকা এখানে কিছু নেই, এ হলো রাজবাড়ি। এখান থেকে চলে যাও তুমি—

সূয্যি বললে—আমি এতকাল ধরে এই গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসছি, কখনও তো এ-রাজবাড়ি দেখিনি।

—তা দেখনি দেখনি। কানা মানুষ কি সব কিছু দেখতে পায় ?

সূয্যি তবু ঘাবড়ালো না। বললে—এটা রাজ-বাড়ি বলছো, তা রাজা কোথায় ? রাজা-কোটাল-মন্ত্রী-সেনাপতি-সৈন্য-সামন্ত, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না—তারা সব কোথায় গেল ? এ কোন্ দেশ ? এ দেশের নাম কী ?

লোকটা এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—তুমি কোথাকার লোক হে ? এসো, আমার সঙ্গে এসো—

বলে সূয্যিকে নিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসালো। এতক্ষণে সূয্যি ভালো করে দেখতে পেলে লোকটাকে। চাকর-বাকর ভেবেছিল প্রথমে। তা নয়।

লোকটা বললে—এ দেশের নাম হলো জম্বু দ্বীপ!

—জম্বু দ্বীপ?

লোকটা হাসলো। বললে—নাম শোননি, বুঝি? তা শুনবে কি করে? এ-দ্বীপ কি আর আছে? এ নেই। মানচিত্র থেকে এর নাম মুছে গেছে এককালে এখানে রাজা ছিল, মন্ত্রী ছিল, সেনাপতি ছিল, প্রজা ছিল, সব ছিল। কিন্তু ওই দেখ, রাস্তা-ঘাট-বাজার সব ফাঁকা পড়ে আছে, কোনও লোক-জন নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে সূয্যি। সত্যিই সব খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও কেউ নেই। বললে—তা এ-রকম দশা হলো কেন এ-দেশের?

লোকটা বললে—সে এক লম্বা গল্প—ওই যে দেখছো পাথরের নুড়ি পড়ে আছে, ওইটে আগে ছিল রাজার মূর্তি। আমাদের রাজার নাম ছিল বক্রুবাহন। বক্রুবাহনের নাম শুনেছ?

সূয্যি বললে—না—

—চলো তোমাকে দেখাই সব গিয়ে। দেশে গিয়ে তোমাদের দেশের লোকের কাছে এই গল্প বলো।

বলে লোকটা বাইরে নিয়ে গেল সূয্যি-কানাকে।

—ওই যে-মূর্তিটার কথা বললুম, আসলে এই জম্বু দ্বীপ রাজ্যটা ওই রাজা বক্রুবাহনই প্রতিষ্ঠা করেছিল। আসলে রাজা বক্রুবাহন প্রথমে রাজা ছিল না। গাঁয়ের ছেলে ছিল। খুব বোকা ছিল বলে লোকে ওকে বলতো বোবা। পাগলা-ছাগলা মানুষ। কেউ ওর কথা মানতো না, শুনতো না। আমলই দিত না কেউ ওকে। তার ওপর ছিল গরীব। একেবারে বনেদী গরীব। তিন-চার পুরুষ ধরে গরীব ছিল ওরা। ভালো করে পেট ভরে খেতে পেত না, পরতে পেত না, লেখা-পড়াও জানতো না কিছু। লেখা-পড়া যে করবে, তাতেও তো টাকা-পয়সা চাই। সে টাকা কে দেবে?

যখন বড় হলো তখন আস্তে-আস্তে অন্য বন্ধুরাও বেশ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠলো। অনেকের নাম-ধাম হলো, অনেকের গাড়ি হলো, বাড়ি হলো। তখন আর কেউ মানতে চায় না। সবাই বলতো—ওটার কিসসু হবে না।

স্কুলের মাস্টার থেকে শুরু করে পাড়ার লোকটা পর্যন্ত বলতে লাগলো—ওটা একটা অপদার্থ—

'অপদার্থ' কথাটা শুনে-শুনে একদিন বোবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বললে—তুত্তোরি নিকুচি করেছে—

কিন্তু বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবে? যেখানে যাবে, সেখানেই তো লোকে তাকে পাগল বলবে, অপদার্থ বলবে। কিন্তু তা বলে বাড়িতে তো আর থাকা চলবে না। যত অসুবিধেই হোক তাকে বাড়ি ছেড়ে বেরোতেই হবে। যেখানে নিজের মনের মত লোক পাবে, সেখানেই চলে যাবে।

তাই একদিন বলা-কওয়া নেই, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো বোবা। গ্রাম ছেড়ে মাঠ, মাঠ ছেড়ে আবার গ্রাম। এমনি করে অনেক দূরে গিয়ে রাস্তায় একজনের সঙ্গে দেখা হলো বোবার। পরস্পরের পরিচয় হলো। সে লোকটাও বোবার মত মনের দুঃখে কষ্ট পাচ্ছে। লোকটার নাম খোঁড়া। খোঁড়া বলেই সবাই তাকে ডাকে। অথচ আসলে সে খোঁড়া নয়।

বোবা বললে—তুমি খোঁড়া নও, তবু তোমাকে সবাই খোঁড়া বলে কেন?

খোঁড়া বললে—যেমন তুমি। তুমি বোবা নও, তবু তো সবাই তোমাকে বোবা বলে।

বোবা বললে—সেই জন্যই তো দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি—

খোঁড়া বললে—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি ভাই, আমারও আর গাঁয়ে থাকতে ভাল্লাগে না—

বোবা জিজ্ঞেস করলে—তোমার কষ্টটা কি?

খোঁড়া বললে—দেখ ভাই, সবাই বেশ নিয়ম মেনে চলছে, এটা আমার খারাপ লাগে। সকালবেলা ঠিক সময়ে সবাই ঘুম থেকে উঠবে, এটা কি ভালো কথা? আমার যদি ইচ্ছে হয়, আমি বিকেল তিনটের সময় ঘুমোতে যাবো, আর সারা রাত জেগে বসে তাস খেলবো, তা কারো পছন্দ নয়। আসলে আমার এই নিয়ম মেনে চলা ভালো লাগে না ভাই—

বোবা বললে—ঠিক বলেছ ভাই, আমারও তা ভালো লাগে না। নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করে। চারদিকে এলোমেলো দেখলে খুব ভাল লাগে—

খোঁড়া বললে—আমারও ভাই ঠিক তাই—

বোবা বললে—তোমার আর আমার যখন একই মত, তখন এসো ভাই আমরা একসঙ্গে বেরোই। আমরা আর এদেশে থাকবো না, এমন দেশে যাবো সেখানে আইন, নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, যেখানে শুধু আড্ডা দেব, তাস খেলবো, ভোরবেলা ঘুমোতে যাবো, রাত হলেই জেগে উঠবো, আবার ইচ্ছে হলে খাবো না। যদি কেউ কাজ করতে চায়, তো তাকে কাজ করতে দেব না।

এইরকম আরো অনেক মতলব আঁটলো দু'জনে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে দু'জনেই সোজা চলতে লাগলো হেঁটে-হেঁটে। কিন্তু কোথাও গিয়ে পছন্দ হলো না। যে-দেশেই যায়, সে-দেশেই দেখে লোকে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করছে। কেউ বড় হলে, দশ জনে মিলে তাকে ছোট করবার চেষ্টা করছে না। কেউ পরিশ্রম করে টাকা-কড়ি জমালে তা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে না। ও-সব ভালো লাগলো না তাদের। ও-সব নিয়মই যদি মানবো, তাহ'লে নিজের দেশে থাকলেই পারতাম। দেশ ছেড়ে এত কষ্ট করে এত দূরে বিদেশে এলাম কেন ?

খোঁড়া বললে—চল্ বোবা, অন্য কোথাও যাই—

আবার পথ চলতে লাগলো দু'জনে। সব জায়গাতেই এক রকম। রাস্তায় নোংরা ফেললে পুলিসে ধরে। পরের জিনিষ চুরি করলে জেলে পোরে। বড় জঘন্য দেশ সব। কেবল আইন-কানুনের কড়াকড়ি। স্বাধীনতা নেই কিছু।

শেষ পর্যন্ত একটা দেশে এসে পৌঁছুল দু'জনে। জায়গাটা বেশ ভালো লাগলো দু'জনের। বেশ খোলা-মেলা। প্রচুর খাবার-দাবার। জল-কষ্ট নেই গাছে ফল-পাকড়, পুকুরে মাছ। একটু চাষ করলেই ধান হয় খুব। বেশী খাটতে হয় না। খাটুনিকে দু'জনে ঘেন্না করে, আর খাবার উপায়ও নেই সেখানে। একটু পরিশ্রম করেছে কি ঘেমে-নেয়ে উঠবে।

খোঁড়া একজনকে জিজ্ঞেস করলে—এ জায়গাটার নাম কী ?

লোকটা বললে—জম্বুদ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ জায়গাটা সত্যিই ভালো লাগলো খোঁড়া আর বোবার। খোঁড়া বললে—আয় বোবা, এখানেই আমরা থেকে যাই—

বোবা বললে—কিন্তু এরা আমাদের থাকতে দেবে কেন এখানে ?

খোঁড়া বললে—খুব থাকতে দেবে। এখানকার লোকগুলো খুব খুব সৎ, মোটে মিথ্যে কথা না। এদের বোঝাব আমরা খুব বড়লোক। দেশে আমাদের অনেক টাকা-কড়ি আছে! আমরা যা বলবো, এরা তাই-ই বিশ্বাস করবে।

কিছুদিন থাকতে-না-থাকতেই ফল ফলতে শুরু করলো, নানা রকম লোক জুটতে লাগলো ওদের দলে। সবাই জানলে, এই দু'জন খুব বড়লোক। নিজেদের দেশ ছেড়ে নিজেদের সম্পত্তি ত্যাগ করে ওরা আমাদের ভালো করতে এসেছে। আমাদের ভালোর জন্যেই ওরা এত দূর থেকে এখানে কষ্ট করতে এসেছে। আমাদের দেশের উন্নতি হলেই ওরা চলে যাবে।

খোঁড়া সকলকে বললে—ভাই, তাহ'লে তোমরা একদিন আমাদের

সংবর্ধনা দাও, সেখানে আমরা বক্তৃতা দেব—

সবাই তোড়জোড় করতে লাগলো সংবর্ধনার। মান-পত্র, ফুলের মালা, ধূপ, ধুনো, সব কিছুর ব্যবস্থা হলো।

খোঁড়া বললে—আর টাকা দিচ্ছো না তার সঙ্গে?

তারা বললে—টাকা আমরা কোথায় পাবো হুঁজুর? আর টাকাটা তো সব নয়। আমরা তো জানি টাকার চেয়ে শ্রদ্ধা বড়, সেই শ্রদ্ধাই আপনাকে আমরা দেবো।

বোবা তো কথাটা শুনে রেগে বললে—বলছো কী হে তোমরা, পৃথিবীতে টাকা না হলে কি কিছু হয়? শ্রদ্ধা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? তোমাদের দেশে এত লোক রয়েছে, সবাই যদি আট আনা করেও তাহ'লেও তো এক লক্ষ টাকা উঠে আসে।

কথাটা ভাববার মত। জম্বুদ্বীপের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো। সবাই বললে—ঠিক আছে, আমরা মাথা-পিছু এক টাকা করেই দেব। কিন্তু খোঁড়াবাবু আর বোবাবাবুর কোন গুণের জন্যে টাকা দেব?

আবার তারা হাজির হলো গিয়ে খোঁড়া আর বোবার কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আজ্ঞে, সবাই জিজ্ঞেস করছে আপনাদের কী-কী গুণ?

খোঁড়া বললে—সে কী, তোমরা আমাদের গুণের কথাটাই জানো না? তাহ'লে আমাদের সংবর্ধনা দিতে যাচ্ছ কেন? আমাদের কী-কী গুণ, তা শুনে নাও। আমরা হচ্ছি ত্যাগী, পরোপকারী, দয়ালু, পরিশ্রমী। এই যে আজকে আমার নাম খোঁড়া, তা কীসের জন্যে? একটা ছেলের জীবন বাঁচাতে আমার নিজের পা ভেঙেছি। আর ঐ যে বোবা, ভালো করে কথা বলতে পারে না, ও কীসের জন্যে? পরের দুঃখে এত কাতর হয়েছে, ও যে মুখের কথা পর্যন্ত আটকে গেছে। সেই জন্যেই তো ও ভালো করে কথা বলতে পারে না।

কথাটা শুনে সবাই আশ্বস্ত হলো। মানপত্রও লেখা হলো সেই ভাবে। দু'জনের ত্যাগ, পরোপকারীতা, দয়া আর পরিশ্রমের কথা সবিস্তারে লেখা হল। টাকার ওপর নিস্পৃহতার কথাও লেখা হলো—এমন নির্লোভ মানুষ সচারাচর দেখা যায় না, শুধু মাত্র জম্বুদ্বীপের মানুষের উপকারের জন্যেই স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন, তাও লেখা হলো।

শেষে এক লক্ষ টাকার একটা বাণ্ডিলও দেওয়া হলো দু'জনকে।

খোঁড়া-বোবা খুব খুশী। অভিনন্দনের উত্তরে তারা বললে—যে-টাকা আপনারা আমাদের হাতে তুলে দিলেন, আমরা এর অছি মাত্র। আপনারা

আমাদের সম্মান দিয়ে মনুষ্যত্বকেই সম্মান দিলেন। আমরা সেই মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই এ টাকা মাথায় তুলে নিলাম। আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করছি এ-টাকা মনুষ্যত্বের উন্নয়নের জন্যেই খরচ করবো। নিজেদের ভোগ-বিলাসের জন্যে খরচ করবো না—

সবাই হাততালি দিতে লাগলো খোঁড়ার কথা শুনে।

বক্তৃতার শেষে সবাই এসে ছেঁকে ধরলো খোঁড়া আর বোবাকে। তারা বললে—আপনাদের একজনকে আমাদের দেশের রাজা হতে হবে হুঁজুর—

খোঁড়া বললে—কিন্তু আমি তো জম্বুদ্বীপের রাজা হতে চাই না, শুধু সেবা করতে চাই আপনাদের।

এ-কথায় তাদের জেদ আরো বেড়ে গেল। জম্বুদ্বীপের রাজা তখন বেগতিক দেখে বললে—আপনিই রাজা হোন খোঁড়াবাবু, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আর আমার ছেলে-পুলেও নেই। তা ছাড়া আমি তো আর দু'দিন বাদে মারা যাবো—

তা সত্যিই তিনি তখন মরো-মরো। ক'দিন বাদেই তিনি মারা গেলেন। সবাই খোঁড়াকেই রাজা করে দিলে, আর বোবাকে করে দিলে মন্ত্রী।

রাজা হয়েই খোঁড়া প্রথম নিয়ম করে দিলে—কেউ কোনও কাজ নিয়ম করে করতে পারবে না। নিয়ম মানলেই তার জেল হবে।

তারপরেই আইন হলো—যে সবচেয়ে বেশী আড্ডা দিতে পারবে, রাজা তাঁদের প্রতি বছর একটা করে পুরস্কার দেবেন—

তারপরে আর একটা আইন হলো—সপ্তাহে একটা করে ছুটির দিন, সেটা বাড়িয়ে তিনদিন ছুটি ঘোষণা করা হলো।

সবাই মহা খুশী। কাজ করতে হবে না, অথচ মাইনে পাবে। এ রকম রাজা আর কখনও কোন দেশে তারা দেখেনি। অফিসে যারা কাজ করতে আসবে, তারা মন দিয়ে কাজ করলেই তাদের শাস্তি হবে। জোর-জুলুম বে-আইনী। কাউকে কোনও জোর-জবরদস্তি করা হবে না। সবাই খুশীমত কাজ করবে। যে-কাজে তারা খুশী হবে না, সে-কাজ তারা করবে না। কারণ খুশী না থাকলে কাজও ভালো হবে না। খুব ভালো কথা। অফিসের কেরানীরা অফিসে এসে সারাদিন গল্প করে আড্ডা দিয়ে কাটাতে লাগলো। যে যখন খুশী আসতে লাগলো, যখন খুশী চলে যেতে লাগলো। চাষীরা চাষ-বাস ছেড়ে দিয়ে খামারে বসে ঘুমোতে লাগলো। ব্যবসাদাররা সময়মত

দোকান খোলে না, খদ্দের সময়মত জিনিস পায় না। সারা রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়ে গেল। গান-বাজনা বেড়ে গেল, থিয়েটার-নাটক চলতে লাগলো দিন-রাত।

প্রজারা বললে—জয় হোক মহারাজার—মহারাজা দীর্ঘজীবি হোক—

যাদের কম বয়েস তাদের আর স্কুলে যেতে হয় না। লেখা-পড়া করবার বালাই নেই। পরীক্ষা দিতে গিয়ে টোকাটুকি করলেও আরো আপত্তি নেই বই দেখে-দেখে লিখলেও কেউ কিছু বলবে না। সবাই পাস। আগে টেবিল-চেয়ার ভাঙাভাঙি হতো, তা বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ যদি কোশ্চেন বুঝতে না পারে, তাদের উত্তর বলে দিতে হবে।

জম্বুদ্বীপের সে এক মহা-আনন্দের যুগ। বলতে গেলে রামরাজ্য। রাজা খুশী, মন্ত্রী খুশী, প্রজারাও খুশী। আর কোথাও কারো মনে কোনও অভিযোগ নেই, কোনও বিরোধও নেই। খোঁড়া সিংহাসনে বসে থাকে, আর সকলে এসে তার পায়ের ধুলো নেয়। বলে—আপনি দীর্ঘজীবি হয়ে বেঁচে থাকুন রাজামশাই—আপনার মত রাজা আর কখনও আমাদের হয়নি—

খোঁড়া শুধু তৃপ্তির হাসি হাসে, আর সকলকে আশীর্বাদ করে।

কিন্তু যখন আরো নাম-খ্যাতি বাড়লো, তখন খোঁড়া আর বোবা পরামর্শ করলে—এবার জম্বুদ্বীপে তাদের নামটা চিরস্থায়ী করে রাখতে হবে। তাদের মৃত্যুর পরেও যাতে সবাই তাদের পূজো করে। বেঁচে থেকে তো সবাই-ই পূজো পায়, মরার পরে যারা পূজো পায়, তারাই তো সত্যিকারের মহৎ।

তাই ঠিক হলো দু'টো পাথরের মূর্তি তৈরী করে শহরের পাঁচমাথা রাস্তার মোড়ের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এঞ্জিনীয়ারদের খবর নেওয়া হলো। তারা সব ব্যবস্থা করে দিলে। পাথরের দু'টো মূর্তি তৈরী হলো। বিরাট মানুষ-সমান শ্বেত পাথরের দু'টো মূর্তি। মূর্তি দু'টো যেদিন প্রতিষ্ঠা হলো সেদিন খুব ধুম-ধাম।

সবাই ভূরি-ভোজ খেলে সরকারী খয়রাতে। জম্বুদ্বীপের মানুষের কল্যাণের জন্যে রাজা যে খয়রাতি করলেন, তার জন্যে রাজ্যের ব্রাহ্মণসমাজ ভূরি-ভূরি আশীর্বাদ করলো। সারাদিন-সারারাত ধরে উৎসব হতে লাগলো রাজ্যময়। কাজ-কর্ম দোকান-পাট সব বন্ধ রইলো।

এমনি করেই পাকা হয়ে গেল খোঁড়া আর বোবার প্রতিপত্তি।

সবাই এবাই বাক্যে বললে -জয় হোক আমাদের রাজার—জয় হোক আমাদের মন্ত্রীর—

খোঁড়া বোবাকে ডেকে বললে—এবার তো আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। আর আমাদের কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবো না—

বোবা বললে—তা পারবে না বটে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না ভাই—

খোঁড়া বললে—দূর বোকা, আর ভয় কীসের। অমন শহরের মধ্যে পাঁচ রাস্তার মোড়ে আমাদের দু'জনের শ্বেত পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, আর কীসের ভয়?

বোবা বললে—না, শুনছি না কি কয়েকজন পাণ্ডা গোছের লোক আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে—

খোঁড়া বললে—তাতে ভয় কাসের, তাদের ঘুঁষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দে—

বোবা বললে—সে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তারা টাকাও নেবে না, সরকারী চাকরিও নেবে না।

—তাহ'লে 'পদ্মশ্রী' খেতাব দিয়ে দে!

—না, তাও নেবে না।

—তাহ'লে তাদের ফাঁসি দিয়ে দে—

বোবা বললে—না, ফাঁসি দিলে লোকেরা ক্ষেপে যাবে।

—কেন, ক্ষেপে যাবে কেন?

বোবা বললে—তারা আসলে খুব সাঁচ্চা লোক। তারা সত্যি কথা বলে, তারা পরিশ্রমী, তারা ত্যাগী।

—সর্বনাশ! তাহ'লে কী হবে? ওই সব লোকগুলোকেই তো আমরা বেশী ভয় করি। ওদের যেমন করে হোক এ-রাজ্য থেকে বিদেয় করে দে!

বোবা বললে—কিন্তু তাতে যদি সবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে?

খোঁড়া বললে—বিদ্রোহী হবে কেন? লোকেরা তো সবাই আমাদের ভালোবাসে।

বোবা বললে—না, কিছু লোক আমাদের আর শ্রদ্ধা করছে না—

—কেন?

বোবা বললে—তারা বলছে আমাদের পথে চলতে গিয়ে দেশ গরীব হয়ে গেছে। চালের দাম বেড়ে গেছে। অনেকে পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে না।

খোঁড়া বললে—সে কী? সে-কথা তো আমার কানে আসেনি।

বোবা বললে—তোর কানে কথাটা তুলিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম ওরা এমনিতেই জব্দ হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ওরা

প্রাণ দেবে, তবু ঘুঁষ নেবে না—

খোঁড়া বললে—কিন্তু ঘুঁষ নেয় না এমন লোক তো ভাল নয়!

বোবা বললে—সে তো আমি জানি! এতদিন তো ঘুঁষ দিয়ে দিয়েই এ-রাজ্য চালিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন আর তা পারছি না।

—তাহ'লে কী হবে?

বোবা বললে—আমি ভেবেছি ওদের খুন করে ফেলবো—

—কাকে দিয়ে খুন করবি?

—আমি নিজের হাতেই খুন করবো।

—কেন, পুলিস ডেকে তাদের হাতে তুলে দে!

বোবা বললে—পুলিসও ওদের গায়ে হাত তুলবে না। তাহ'লে পুলিসও খুন হয়ে যাবে। এখন পুলিসকেও আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

খোঁড়া বললে—তাহ'লে কি সবাই আমাদের বিরুদ্ধে?

বোবা বললে—না, অর্ধেক লোক আমাদের দলে, আর বাকী অর্ধেক ওদের দলে—

খোঁড়া বললে—এখন কী হবে?

বোবা বললে—আমাকে নিজেকেই আসরে নামতে হবে। যা করবার আমি নিজেই করবো, তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোঁড়াকে সত্যি-সত্যিই ভাবতে হলো। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে ভীষণ শব্দ শুনতে পেলে। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে বাইরের মাঠে বিরাট একটা মিছিল আসছে। তাদের হাতে বর্শা-লাঠি সড়কি। খোঁড়া ভয় পেয়ে তার প্রহরীদের ডাকলে।

একজন এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই খোঁড়া বললে—ওরা এত গোল-মাল করছে কেন, ওদের থামতে বল্‌গে—

সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরীরা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল। খোঁড়া ডেকে পাঠালো বোবাকে। একজনকে হুকুম দিলে—মন্ত্রীমশাইকে ডেকে নিয়ে আয়—

কিন্তু মন্ত্রীমশাই কোথাও নেই। তাকে কেউ খুঁজে পেলে না। শেষ-কালে একজন এসে বললে—মন্ত্রীমশাইকে প্রজারা কেটে ফেলেছে হুঁজুর—

শুনে খোঁড়ার চক্ষুস্থির। বাইরে তখন দু'দলে তুমুল মারামারি চলছে। দেখতে-দেখতে রাজার প্রাসাদেও আগুন লাগিয়ে দিলে কারা। আগুন নেভাবার চেষ্টা হলো। কিন্তু পারলে না। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে

উঠলো শহরে, গ্রামে, রাস্তায়, সব জায়গায়।

সে এক বীভৎস কাণ্ড। কাতারে-কাতারে লোক মরতে লাগলো। খোঁড়াও পালাবার চেষ্টা করলে জম্বুদ্বীপ ছেড়ে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলে সব জায়গাতেই মারাবারি খুনোখুনি চলছে। তারই এক ফাঁক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই কে একজন তাকে গুলি করে মারলে। খোঁড়া শেষ বারের মত চেয়ে দেখলে যে তাকে গুলি করে মেরেছে, সে তারই প্রহরী। [illegible] পড়লো। কিন্তু প্রজারা তাতেও ঠাণ্ডা হলো না।

তারা তখন ছুটলো সেই শ্বেত-পাথরের মূর্তি দুটোর দিকে। কোথা থেকে লোহার বড়-বড় ডাণ্ডা নিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে ভাঙতে লাগল মূর্তি দু'টোকে। তারপর চললো হুল্লোড়। মূর্তির টুকরোগুলো নিয়ে লোফা-লুফি-ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে লাগলো। সবাই মিলে চীৎকার করতে লাগলো—খোঁড়া রাজা মুর্দাবাদ, বোবা মন্ত্রী নিপাত যাক—

সমস্ত দিন-রাত ধরে ওই একই কাণ্ড। দোকান-পসারী বন্ধ, সারা শহরে হরতাল। অরাজক অবস্থা চারদিকে। পুলিস নেই, রাজা নেই, মন্ত্রী নেই, সমস্ত জম্বুদ্বীপময় কেবল চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি আর রক্তারক্তি কাণ্ড। হাজার-হাজার, লাখ-লাখ লোক রাস্তায় মরে পড়ে রইল। সেবা করার, সৎকার করবারও নেই কেউ। দেখতে-দেখতে সূর্য ডুবলো।

এমনি করে চলতে লাগলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তারপর বহুদিন পরে যখন আস্তে-আস্তে সব থেমে গেল, রাজ্যে আর জ্যান্ত মানুষ কেউ নেই। যে দু'একজন তখনও বেঁচে ছিল, তারা বোধহয় ততদিনে অন্য কোনও দ্বীপে পালিয়ে বেঁচেছে। তারপর শেয়াল-কুকুরে-শকুনে দেশ ভরে গেল।

আর তারপর থেকে এই তো…। খোঁড়া রাজা। কিন্তু রাজা হবার পর খোঁড়ার নাম হয়েছিল বক্রবাহন। বক্রবাহন বর্মা নাম নিয়েই খোঁড়া এখানে রাজত্ব করতো। এখন সে-সব কিছুই নেই।

বলে সূর্যি-কানা থামলো। বললাম—তারপর?

সূর্যি-কানা বলতে লাগলো—তারপর আর কি? আমি চারদিকে চেয়ে দেখছি। সত্যিই সব খাঁ-খাঁ করছে। দেখতে-দেখতে ভাবলাম, আমাদের দেশেরও তো ওই একই অবস্থা! আমাদের নবাবগঞ্জের ঘাটে আর তো তেমন মহাজনী নৌকো আসে না। ধান-চালের কারবার উঠে গেছে নবাব-গঞ্জের হাট থেকে। এখন তো কিছু-কিছু চাল আসে, গম আসে রেলগাড়িতে।

কোথা থেকে আসে, তা কেউ জানে না। লোকে বলে আমেরিকা, কেউ বলে রাশিয়া, আবার কেউ-কেউ বলে অন্ধ্র, কিংবা উড়িষ্যা!

লোকটা আবার জানালার দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো ভেতরে। আমি আর থাকতে পরলাম না সেখানে। আমার কেবল নবাবগঞ্জের কথা মনে পড়তে লাগলো। তাহ'লে কি আমাদের দেশেও খোঁড়া রাজা, বোবা মন্ত্রী? আমাদের দেশেও কি অমনি করে একদিন লুঠতরাজ হবে? মারামরি-লাঠালাঠি, রক্তারক্তি কাণ্ড হবে? আমাদের দেশের কি একদিন ওই জম্বুদ্বীপের মত খাঁ-খাঁ করবে?

আমার ভয় করতে লাগলো বাবু!

আমি জল থেকে তো উঠে এলাম। কিন্তু বুকে আর বল পেলাম না। আড়তদার হরিমোহন সামন্ত সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সামন্তমশাই জিজ্ঞেস করলে— কী গো স্যুর্যি-ডুবুরি, হদিস পেলে কিছু?

আমি জবাব দিলাম—না—

বলে নবাবগঞ্জের ঘাট থেকে বাড়ি চলে এলাম। ভাবলাম আর কী হবে বেঁচে থেকে। কত মেহনত করে সংসার করেছি। এ তো কিছুই থাকবে না। খোঁড়া-বোবার রাজত্বে তো আর গুণের কদর নেই। সত্যিকথারও দাম নেই। সরকার-গোমস্তাকে ঘুঁষ দিয়ে চাষের জমির ইজারা লিখিয়ে নেওয়া যায়। ঘুঁষ দিতে পারলে সরকারের নেক-নজরে পড়া যায়। তাহ'লে আর ভগবানের হুনিয়ায় মজুরী-মেহনত কার জন্যে করছি? কার জন্যে দম বন্ধ করে জলে ডুবুরীর কাজ করেছি? সরকারের-কাছারির খোশামোদ করেই তো পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে দিন গুজরান করতে পারি!

বলতে-বলতে স্যূর্যি-কানা ধরানো বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

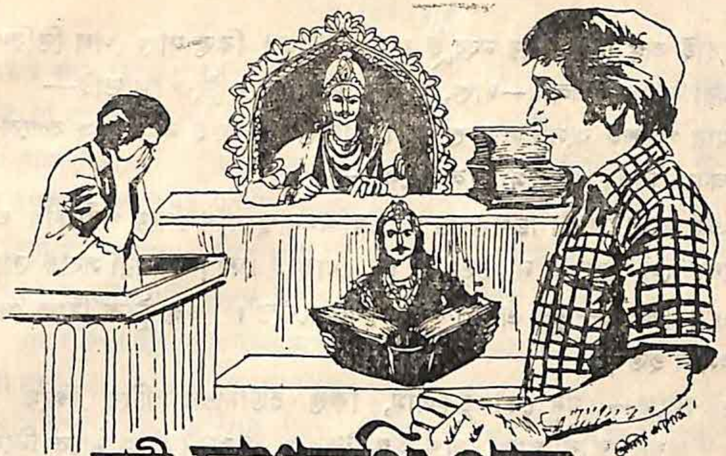
বললে—আমি ডুবুরি হয়েছিলুম কি শুধু পয়সা রোজগারের জন্যে বাবু? পয়সা তো চুরি-ডাকাতি করেও রোজকার করা যায়। ভাবতুম ডুবুরীর কাজে হু'টো পয়সাও রুজি-রোজগার হবে, আবার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের উব্‌গার করতেও পারবো। কিন্তু দেখলাম, না মানুষের উব্‌গার করতে গেলে সেই মানুষই চেপে বসে। ভাবে আমি বুঝি পয়সার কাঙাল। ওই আড়তদার হরিমোহন সামন্ত মশাইদের কাছে আমি তাঁবেদার বই আর কিছু নই! ওরাই আমাদের নবাবগঞ্জের এই হাল করেছে বাবু। এতে লাভটা কার হলো? হরিমোহন সামন্তর, না আমার-আপনার? কারোই কিছু লাভ হলো না। তাই এখন নবাবগঞ্জের হাটে চাল আসছে আমেরিকা থেকে, অন্ধ্র থেকে, উড়িষ্যা থেকে। আবার দেখবেন সে-দেশেও একদিন হরিমোহন সামন্ত মশাইরা গিয়ে

হাজির হবেন। তখন বুঝবে এই সূর্য্যি-কানা ঠিক, না হরিমোহন সামন্ত'রা ঠিক! আমার পরে গণেশ বাউরিরা ডুবুরীর কাজ করতো, এখন তারাও বেকার। এর পর সকলের আমার মত দশা হবে। দেখে নেবেন আপনি—

বলে সূর্য্যি-কানা চলতে লাগলো।

বললে—যাই বাবু, রেশনের দোকানে লাইনে দাঁড়াই গে—

———



সাক্ষী দাশরথি পাল

নাম তার দাশরথি পাল। আমরা কিন্তু তাকে 'দাশু' বলে ডাকতাম। ছোটবেলায় দাশু ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। কেন যে দাশু আমার প্রাণের বন্ধু হয়েছিল, তা জানি না। বলতে গেলে এমন কোনো গুণ ছিল না দাশুর, যার জন্যে কেউ তার প্রাণের বন্ধু হবে।

কিন্তু একটা গুণ ছিল তার। সব চেয়ে বড়! সে প্রাণ গেলেও মিথ্যে কথা বলতে পারত না। সেই যে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমরা পড়েছিলুম—'সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কহে, সকলে তাহাকে ভালবাসে' সেই কথাটা বোধ হয় সে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিল। বইতে বইতে অমন কত ভাল কথাই তো লেখা থাকে, কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করলে কি আর সংসার চলে?

কিন্তু দাশু বলতো—না ভাই, আমার মা বলে দিয়েছে সব সময় সত্যি কথা বলবে—

আমরা স্কুলে খারাপ ছেলের দলে ছিলাম। লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতাম। দাশুও এমন কিছু ভাল ছেলে ছিল না। পড়াশুনায় মন ছিল কিন্তু পরীক্ষায় তেমন ভাল রেজাল্ট করতে পারতে পারতো না। কোনো রকমে টায়ে-টোয়ে পাশ করতো!

একবার পরীক্ষার সময় আমাদের ক্লাসে গণেশ বই দেখে-দেখে অঙ্ক টুকছিল। গার্ড ছিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার রোহিণী বাবু, তিনি দেখেও কিছু দেখছিলেন না। বুঝতে পেরেছিলেন ছাত্ররা বই থেকে অঙ্ক টুকছে। চোখ দুটো বুঁজিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। গণেশের কাছ থেকে

আমরা সবাই অঙ্ক টুকে নিয়ে নব্বুই মার্ক পেলাম। কিন্তু দাশু পেল তিরিশ।

আমরা ক'বার বললাম—দাশু, আমার খাতা দেখে টুকে নে ভাই—

আমার পাশেই বসেছিল দাশু। সে কিন্তু কিছুতেই না। সে বললে—না, পরীক্ষায় টোকা পাপ, মা বলে দিয়েছে—

তা এই রকম বোকা ছিল দাশু। যে অমন সুযোগ পেয়ে পরীক্ষায় অঙ্ক না টোকে, সে বোকা না তো কী? বোকাই তো! আমরা সবাই তাকে বাইরে এসে বললাম—তুই একটা আস্ত বোকাচন্দর। অঙ্ক টুকে নিলে তোর কী লোকসান হত?

দাশু বললে—এখন তো টুকলাম, কিন্তু ইউনিভারসিটিতে গিয়ে কী করবো? তখন কার খাতা দেখে অঙ্ক টুকব? তখন তো আমাকে নিজেই অঙ্ক করতে হবে।

দাশুর অত সত্যবাদিতা আমার ভাল লাগতো না। কিন্তু এত দোষ থাকা সত্ত্বেও দাশু আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। আমি তাকে শেখাতাম যে পৃথিবীটা বড় শক্ত জায়গা। এখানে মিথ্যে কথা না বললে টেঁকা যাবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইতে যাই লেখা থাকুক, সংসারে যে মিথ্যে কথা বলে তারই এখন জয় হয়।

যে বুঝেও বোঝে না, তাকে বোঝানো বৃথা। অথচ দাশুদের এক-কালে অবস্থা খুব ভাল ছিল। বিরাট বাড়ি। বাড়িটার দামই কম করে তখনকার দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। কিন্তু সবই গিয়েছিল দাশুর পিসেমশাইয়ের কারসাজিতে। দাশু যখন ছোট ছিল, তখন তার বাবা বিরাট বিষয়-সম্পত্তি রেখে মারা যায়। দাশুই ছিল, একমাত্র ছেলে। তখন দাশুর কম বয়েস। দেখাশোনা করার মত ছিল শুধু বিধবা মা। বিষয়-সম্পত্তি দেখার জন্য দেশ থেকে দাশুর পিসেমশাই এসে হাজির হলো।

সেই যে পিসেমশাই এসে ধূমকেতুর মত উদয় হলো, তার আর বিনাশ হল না। পিসেমশাই, পিসিমা, পিসতুতো ভাইরা। সবাই এসে জেঁকে বসলো দাশুর বাড়িতে। তখন থেকেই আস্তে-আস্তে দুর্দশা সুরু হলো দাশুর।

দাশুর পিসেমশাই ছিল ঘুঘু মানুষ। দাশুর বাবার টাকা নিয়ে দাশুর ভাল করার জন্যে কাঠের ব্যবসা শুরু করে দিলে, আর সেই ব্যবসা যখন ফুলে-ফেঁপে উঠলো, তখন দাশু আর দাশুর মাকে আলাদা করে দিল।

দাশুর অবস্থা দেখে আমার তখন কান্না পেত।

দাশুর মাও ছিল গোবেচারা ভালমানুষ।

আমি বলতাম—তোর মা'টাই তো বোকা, তোর পিসেমশাই-এর হাতে

কখনও অত বিষয়-সম্পত্তি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে আছে? আজকাল কি আর সে যুগ আছে, যে লোকে এত বিশ্বাসের দাম দেবে?

দাশু বলতো—তুই পিসেমশাই-এর নামে মিছিমিছি দোষ দিস্ নি—পিসেমশাই আমাদের টাকায় ব্যবসা করে নি। করেছে নিজের টাকায়।

আমি বলতাম—বাজে কথা। তোর পিসেমশাইকে আমি দেখেছি। ওর চেহারা দেখেই আমি বলতে পারি তোর পিসেমশাই লোকটা খারাপ।

এসব কথা দাশুর ভালো লাগত না! বলতো, ওসব কথা থাক, তুই অন্য কথা বল—

দাশুদের তখন সত্যিই চরম অবস্থা। সেই পিসেমশাই-এর চক্রান্তে একদিন তাদের বিরাট বাড়িটাই হাতছাড়া হয়ে গেল। দাশুরা একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি উঠে এল। আমরা গরিব লোক। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা বিরাট পুকুর ছিল। দাশুরা সেই পুকুরপাড়ে একটা চালাঘরে থাকতে লাগলো। দাশুর মা কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাতে লাগল। সে কী কষ্ট ওদের! ওর মা এককালে ঝি-চাকর রেখে সংসার করেছে। সেই মা'কেই তখন আবার পুকুরে গিয়ে বাসন মাজতে হতো! কাপড় কাচতে হত নিজের হাতে। নিজের হাতে উঠোন ঝাঁট দিতে হতো। শেষকালে এমন অবস্থা হল যে সে আর চোখে দেখা যায় না। তখন পাড়ার লোকের কাজকর্ম করে দিয়ে কিছু-কিছু টাকা উপায় করতে হলো।

আমি দাশুকে বললাম—তুই পিসেমশাই-এর নামে-মামলা কর—

দাশু অবাক হয়ে গেল। বললে—মামলা? কেন?

—তোদের টাকা ঠকিয়ে নিজের ব্যবসা করলো। ব্যবসা করে এত বড়লোক হলো তোর পিসেমশাই, আর তুই কিছুই করবি না?

দাশু বলতো—নিজের পিসেমশাই-এর নামে মামলা করবো? তুই বলছিস কী?

আমি বলতাম—তা নিজের পিসেমশাই হলেই বা, যে দোষ করবে, তার শাস্তি হবে না?

দাশু বলতো—না ভাই, মা বলেছে কারোর মন্দ কামনা করতে নেই—

—যে খারাপ লোক, তারও মন্দ কামনা করতে নেই?

দাশু বলতো—না, মা তা করতেও বারণ করেছে।

আমি বলতাম—তা'হলে খারাপ লোকেরা জব্দ হবে কি করে?

দাশু বলতো—মাথার ওপর ভগবান আছেন, ভগবানই খারাপ লোকেদের শাস্তি দেবেন, আমি শাস্তি দেবার কে?

অথচ দেখতাম দাশুর পিসতুতো ভাইদের তখন রমরমা অবস্থা। দাশুদের বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবার পর দাশুর পিসেমশাইরা ভবানীপুরে নতুন বাড়ি তৈরী করে তাতে উঠে গিয়েছিল। বিরাট তিনতলা বাড়ি। নতুন গাড়ি চড়ে বেড়াত দাশুর পিসতুতো ভাইরা। তারা সাহেবদের ইস্কুলে পড়তো। দাশু অনেকদিন তাদের গাড়াতে চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছে। কিন্তু তার জন্যে দাশুর কোন রাগ ছিল না। দাশু বলতো—আমি যদি সত্যি কথা বলি, আমি যদি সৎপথে থাকি, তো ভগবান আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

দাশুর দেখতাম যত ভগবানের ভক্তি বাড়ছিল, ততই তাদের অবস্থা খারাপ হতে-হতে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো, রোগা চেহারা। আরো আমি জিজ্ঞেস করতাম—তোদের চলে কী করে?

দাশু বলতো ·মা বাড়িতে-বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে টাকা উপায় করে। আর আমি স্কুল-ফাইন্যালটা পাস করেই একটা চাকরি যোগাড় করে নেব—

—স্কুল-ফাইন্যাল পাস করে কি ভাল চাকরি পাবি?

দাশু বলতো—ভাল চাকরির কী দরকার? সত্তর-আশি টাকা মাইনের চাকরি পেলেই আমার চলে যাবে। তারপর যদি সৎভাবে কাজ করি, তাহ'লে পরে উন্নতি হবেই—

যা হোক, সেবার বর্ষায় আমাদের পাড়ার পুকুরটা ডুবে গেল।

জল থই-থই করছে সমস্ত পাড়াটায়। বাড়ির ভেতর জল ঢুকে গেল শেষকালে। দাশুদের শোবার ঘরেও জল ঢুকলো। সে এক মহা বিপর্যয়।

হঠাৎ শুনলাম দাশু মারা গেছে!

আমার তো মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। আমি দৌড়ে গেলাম দাশুদের বাড়িতে। যাওয়া কি অত সোজা? এক হাঁটু জল ঘরের ভেতর। তিনদিন আগে দাশুর সেই পিসেমশাই হঠাৎ মারা গিয়েছিল। যে পিসেমশাই দাশুদের দেখতে পারতো না, সেই পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দাশু তখনই ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর সেই পিসেমশাই-এর মৃতদেহ নিয়ে কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে পুড়িয়েও এসেছিল। সমস্ত রাত জেগে বৃষ্টিতে ভিজে দাশু নিজের কর্তব্য করেছিল।

আমি দেখা হতে বললাম—কী রে, তোর কি মাথা খারাপ?

দাশুর মুখ-চোখ তখন বসে গেছে। সবে শ্মশান থেকে আসছে।

বললে—কী করব ভাই, পিসতুতো ভাইরা সবাই ছেলেমানুষ, আমি না করলে তো কে করবে? কেউ তো কিছু জানে না। আর মা-ও আমাকে বললেন—বিপদের দিনে লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

—কিন্তু তোরা খেতে পাচ্ছিস, কি বেঁচে আছিস, সে খবর কি তোর পিসেমশাই কোনদিন রেখেছিল ?

দাশু বললে—সে তো ভগবানই আছেন, ভগবানই বুঝছেন, ভগবানই দেখছেন—

আমি বললাম—দূর, তোর ভগবানের নিকুচি করেছে, ভগবান যদি থাকতো তো তোর এই দুর্দশা হতো ? তোর মা'কে ঝি-গিরি করে খেটে মরতে হতো ?

দাশু বললে—ও কথা বলিস নি। মা বলেছে ভগবান সব দেখছেন, পরকালে গিয়ে তার সব বিচার হবে।

আমি বললাম—পরকালে কী হবে সে কথা নিয়ে তুই মাথা ঘামাচ্ছিস, আর ইহকালটা যে ঝরঝরে হয়ে গেল তোর ?

তখন দাশু সারারাত জেগে বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে। অত কথা বলবার সময় ছিল না। দাশু বাড়ি চলে গেল।

ভাবলাম, সেদিন সেই শ্মশানে গিয়েই হয়তো দাশুর সর্দি-কাশি হয়ে মারা গেছে। আমরা সব বন্ধু-বান্ধব যখন দাশুদের বাড়িতে গেলাম, তখন দেখলাম লোকজনে ভরতি হয়ে গেছে বাড়ি। দাশুর মা একধারে বসে কাঁদছে।

আমাদের চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে এল। এতো ভালো ছেলেটা ছিল, সে-ই কিনা মারা গেল! একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—কীসে মারা গেল ?

লোকটা বললে—সাপের কামড়ে—

তা সাপেরই বা দোষ কী! বর্ষার জলে পুকুর ভেসে গেছে। জলের সঙ্গে সাপও ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল।

—সাপটা কোথায় ?

—সে কেউ দেখতে পায়নি। কামড়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

ঘরের ভেতরে তখন অনেক ভিড়। সাপের রোজা এসেছে। দাশুকে একজন ধরে আছে মেঝের ওপর। সাপটা কামড়েছে পায়ের গোড়ালিতে। পা-টা নীল হয়ে গেছে। কয়েকটা জায়গা বাঁধন দেওয়া হয়েছে। আর মন্তর পড়ছে রোজাটা।

আমরা অনেকক্ষণ দেখলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আমাদের কীই বা করবার ছিল। সারা জীবন যে ভগবানকে ভক্তি করে এসেছে, সৎপথে চলে এসেছে, সত্যি কথা ছাড়া মিথ্যে কথা বলেনি, তাকেই কিনা বেছে-বেছে সাপে কামড়ালো ? ভগবানের এই-ই কি সুবিচার ?

বিকেলবেলার দিকে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু পরের

দিন হঠাৎ গণেশ দৌড়তে-দৌড়তে আমার বাড়িতে এলো। বললে—ওরে, দাশু বেঁচে উঠেছে—

—কী করে বাঁচলো? আমি লাফিয়ে উঠেছি খবরটা শুনে। গণেশ বললে—রাত দু'টোর সময় বিষ নেমে গেছে শুনলাম, চল দেখে আসি—

সত্যিই সেবার দাশু বেঁচে উঠলো। আমরা গিয়ে দেখলাম দাশু চোখ চেয়ে আছে। আমাদের চিনতে পারলে। আমরা আর ওকে বিরক্ত করলাম না ওকে শুয়ে থাকতে বলে বাড়ি চলে এলাম। দু'তিন দিন পরে যখন দাশু সুস্থ হয়ে উঠলো, আমি আবার গেলাম দাশুর সঙ্গে দেখা করতে।

বললাম—সে দিন তোর জন্যে আমাদের খুব ভয় হয়ে গিয়েছিল, জানিস।

দাশু চুপ করে রইলো। বিছানায় শুয়ে ছিল দাশু আমার দিকে চেয়ে। আমার কথা শুনে শুধু একটু হাসল। বললাম—আমরা সবাই তোকে দেখতে এসেছিলাম। আমি, গণেশ, ফটিক, বেচারাম সবাই—আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম ভগবানের অবিচার নিয়ে। এত লোক থাকতে শেষকালে কিনা তোকেই সাপে কামড়ালো?

দাশু শুনছিল চুপ করে। কিন্তু ভগবানের অবিচারের কথা বলতেই সে রেগে গেল একটু। বললে···ভগবানের নামে দোষ দিস নি ভাই···আমাকে তো সাপে কামড়ায়নি। আমি সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম—

—তার মানে?

আমি অবাক হয়ে গেলাম তার কথা শুনে।

দাশু বললে—হ্যাঁরে, তোরা তো ভগবানে বিশ্বাস করিস না।

আমি নিজে সব দেখে এলাম গিয়ে। ভগবানকে দেখলাম, যমরাজকে দেখলাম, চিত্রগুপ্তমশাইকে দেখলাম।—

আমি অবাক হয়ে গেলাম! দাশুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

দাশু বললে—বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। তুই তো জানিস আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না, আর কখনও মিথ্যে কথা বলবোও না। সেদিন রাত্তিরে শুয়ে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ একটা লোক এসে আমাকে ডাকলে। তার চেহারা দেখে আমি চিনতে পারলুম না। বললাম—তুমি কে?

লোকটা বললে—স্বর্গ থেকে এসেছি, তোমাকে একবার স্বর্গে যেতে হবে।

বললাম—কেন? আমি কি করেছি?

লোকটা বললে—তোমায় সাক্ষী দিতে হবে—

—কীসের সাক্ষী? কোনও মামলা হচ্ছে স্বর্গে?

লোকটা বললে—হ্যাঁ। শম্ভুনাথ দাস তো তোমার পিসেমশাই? সেই

শম্ভুনাথ দাস কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে—এখুনি চলো—

তা ভাই, আমি আর কি করবো ? ভগবানের ডাক এসেছে, আমি তো আপত্তি করতে পারি না। ঘড়িতে তখন দেখি রাত ত্ব'টো বেজেছে। আমার মুখ দিয়ে তখন আর কথাও বেরুচ্ছে না। মা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। আমি আস্তে-আস্তে লোকটার সঙ্গে চলতে লাগলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি একটা রথ দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ত্ব'টো পক্ষিরাজ ঘোড়া। আমরা উঠে বসতেই রথটা উড়তে লাগল।

আমার আশ্চর্য লাগছিল দাশুর কথা শুনতে। বললাম—তারপর ?

—তারপর ভাই কোথা দিয়ে কেমন করে স্বর্গে পৌঁছে গেলাম, বুঝতে পারলাম না। সেখানে সূর্য উঠেছে বেশ। স্বর্গে তো রাত হয় না। কেবল দিন। এক জায়গায় গিয়ে রথটা থামলো।

আমরা রথ থেকে নামলুম।

একটা মস্ত বাড়ির ভেতর লোকটা আমাকে নিয়ে গেল। চিনতে পারলুম সকলকে। দেখলুম, ভগবান বসে আছেন একটা উঁচু সিংহাসনের ওপরে। তাঁর পায়ের কাছে যমরাজ। তাঁর পাশে যমরাজের পেশকার চিত্রগুপ্তমশাই।

হঠাৎ ডাক পড়ল—সাক্ষী দাশরথি পাল হাজির—

আমাকে যে-লোকটা নিয়ে গিয়েছিল সে বললে— বলো হাজির—

আমিও চীৎকার করে উঠলাম—হা-জি-র—

তারপরে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আমার পিসেমশাই—পিসেমশাই-এর মুখখানা দেখে কেঁদে ফেললুম। এই সেদিন তাকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে এসেছি যে!

—বলো, শ্রীভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

বললুম। যমরাজ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আসামী শম্ভুনাথ দাসকে চেনো।

—চিনি ধর্মাবতায়।

—ইনি তোমার কে ?

—আজ্ঞে, আমার পিসেমশাই।

—ইনি তোমাদের ঠকিয়ে নিয়ে নিজে বড়লোক হয়েছেন ?

আমি কি বলবো, বুঝতে পারলাম না।

—বলো-বলো। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে আনা হয়েছে। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী এই মামলার। তোমার সাক্ষীতেই নির্ভর করবো এঁকে স্বর্গে পাঠাবো না নরকে পাঠাবো—বলো ? উত্তর দাও—

নরক! নরকের নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পিসেমশাই আমার কথার ওপরেই নরকে যাবে? সে যে ভীষণ যন্ত্রণা!

পিসেমশাই এর দিকে চেয়ে দেখলাম। পিসেমশাই-এর চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—কথা বলছো না কেন? তোমাদের সর্বস্বান্ত করেছেন তো ইনিই? এঁর জন্যেই তো তোমার মা'কে পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে কাটাতে হয়?

আমি মহা ভাবনায় পড়লুম ভাই। সত্যি কথা বললে তো পিসেমশাই নরকে যায়, আর মিথ্যে বললেই তো নিজেই নরকে যাবো। করবোটা কী?

আমার যে সে কী যন্ত্রণা, তোকে কী বলবো।

—বলো-বলো দেরী করো না—

শেষকালে ভাবলাম আমি বরং নরকে যাবো, কিন্তু পিসেমশাই? হাজার হোক আমার তো গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই। বললাম—না—

—না মানে?

—তার মানে পিসেমশাই আমাদের কোন ক্ষতি করে নি।

আমার কথা শুনে পিসেমশাইয়ের চোখে মুখে আনন্দের হাসি ফুটল।

আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমিও সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে আসছিলাম, হঠাৎ চিত্রগুপ্ত বললেন—এই সাক্ষী দাশরথি পাল মিথ্যে কথা বলেছে ধর্মাবতার—একে শাস্তি দিতে হুকুম হোক্—

যমরাজ বললেন—তাই হোক্, একে নরকে পাঠিয়ে দাও।

আমাকে ভাই চারজন পেয়াদা এসে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওপর থেকে শ্রীভগবান বাধা দিলেন। বললেন, না, ওকে ছেড়ে দাও, ও মায়ের আদেশ পালন করেছে। ওকে মুক্তি দাও।

আমি বললাম, তারপর?

দাশু বলতে লাগল—তারপর তো ভাই জেগে উঠে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি। আমার চারদিকে লোকজন ভরতি। মা কাঁদছে। শুনলাম, আমাকে নাকি সাপে কামড়েছিল।

এই হচ্ছে দাশরথি পালের গল্প। এবং দাশরথি পাল শেষ পর্যন্ত কিছুই হতে পারে নি। সেই সাধারণ লোকই হয়ে আছে। কিন্তু তবু কখন প্রাণ গেলেও মিথ্যে কথা বলে নি। ছোটবেলায় তার যে রকম অবস্থা, এখনও তার সেইরকমই অবস্থা আছে। তার দারিদ্র্য দশা তার আর ঘুচলো না।



ছেলেবেলা

এখনও মনে পড়লে ভয় হয়। কতকাল আগের ঘটনা। আমার বয়েস তখন বোধহয় পাঁচ কী ছয়। ছ-বছর বয়েসের ছেলেদের সাধারণত কোনও সমস্যা থাকে না। আমরাও সমস্যা ছিল না কিছু। একমাত্র ভয় ছিল লেখা-পড়ার। লেখা-পড়ার কথা কথা ভাবলেই আমার ভয় হতো। বই ছিল যেন আমার কাছে যম। বই পড়তে বললেই আমি ঘুমের ভান করতুম। সঙ্গে-সঙ্গে বাবার বকুনি। বাবা বলতেন—এ বড় হয়ে গাধা হবে—

আমাদের পাড়ার বস্তিতে এক ধোপা বাস করতো। তার একটা গাধা ছিল। মাঝে-মাঝে দেখতুম, ধোপা তার গাধাটার পিঠে বোঝা চাপিয়ে খদ্দেরদের বাড়িতে চলেছে। গাধাটার অবস্থা দেখে আমার বড় মায়া হতো, আর বাবার কথাগুলো মনে পড়তো।

কেবল ভয় হতো বড় হয়ে যদি আমিও ওই ধোপার গাধা হই? তখন বয়েস কম ছিল, তাই হয়ত আমার ভয়টাই ছিল বেশি। তাই একটু রাত হলেই আর বাড়ি থেকে বেরোতুম না। সন্ধ্যে হবার আগেই ফুটবল খেলার মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতুম। ভয় থেকে বাঁচবার জন্যে সেইটেই ছিল আমার একমাত্র পথ।

তারপর আর একটু বড় হলুম। বাবা-মা'র সঙ্গে সেবার গেলুম আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল দেখতে।

বলতে গেলে কলকাতা থেকে সেই-ই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া। প্রথম ছুটি। আগ্রা আমার কাছে নতুন লাগতে লাগলো। তাজমহলের নাম শোনা ছিল। পড়ার বইতে তাজমহলের ছবিও দেখা ছিল। কিন্তু আসল জিনিসটা যে কেমন, তা দেখলুম সেই-ই প্রথম। আমার ছোটাছুটি দেখে বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—ওদিকে যেও না, হারিয়ে যাবে—

একটু চোখের আড়াল হতে পারার উপায় নেই। তাজমহলের বাগানের মধ্যে দৌড়তে-দৌড়তে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলুম, বাবা ছুটে এসে এক ধমক দিলেন। বললেন—ওদিকে একলা-একলা কোথায় যাচ্ছো? হারিয়ে গেলে তখন কী হবে?

আমি যে কেন হারিয়ে যাব, আর হারিয়ে গেলে আমার কী যে সর্বনাশ হবে, তা তখন আমি কিছুতেই বুঝতে পারতুম না। হারিয়ে যাওয়া মানে যে কী, তাও বুঝতে পারতুম না।

আমি বাবাকে জিগ্যেস করতুম—হারিয়ে গেলে দোষ কী?

বাবা বলতেন—হারিয়ে গেলে তখন তুমি এখানে পড়ে থাকবে, আর আমরা সবাই তোমাকে ফেলে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় চলে যাবো, তখন মজাটা টের পাবে—

কথাটা শুনে সত্যিই ভয় হতো। বাবা-মা কেউ কোথাও থাকবে না, এটা ভাবতেও খুব কষ্ট হতো। মনে হতো, বাবা-মা না থাকলে কে খেতে দেবে।

আসলে বাবার যে এত ভয়, তার কারণ ছিল। আমরা যে-হোটেলে উঠেছিলুম সে-হোটেলের মালিক এক বাঙালী। তাঁর নাম কিরণবাবু। নামটা এখনও মনে আছে। তিনি বাবাকে বলে দিয়েছিলেন—এখানে খুব সাবধানে থাকবেন আপনারা, এ-জায়গায় অনেক গুণ্ডা আছে—

আমি বাবাকে জিগ্যেস করতুম—গুণ্ডা মানে কী বাবা?

বাবা বলতেন—ছেলেধরা।

তবু বুঝতে পারতুম না। জিগ্যেস করতুম—ছেলেধরা মানে?

বাবা বলতেন—ছেলেধরা মানে এক ধরনের লোক থাকে, যারা ছোট ছেলে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়—

জিগ্যেস করতুম—ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে?

বাবা বলতেন—ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে খোঁড়া করে দেয়, তারপর অনেক দূর দেশে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধরে বসিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করা পয়সা নিয়ে ছেলেধরারা আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খায়। আর ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে। আর তারা যত ছট্‌ফট্‌ করে, লোকে

তাদের ততো পয়সা দেয়—

বাবার কথায় আমি ছেলেধরার একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলুম নিজের মনে। বেশ গোঁফ-দাড়িওয়ালা মুখ, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি আর হাতে একটা মোটা লাঠি! রাস্তায় বাবার সঙ্গে টাঙ্গা বা এক্কায় যেতে-যেতে দু-ধারে চেয়ে দেখতুম। ওই রকম কোনও পোশাক-পরা লোক দেখলেই বাবাকে দেখাতুম। বলতুম—ওই দেখ বাবা ছেলেধরা—

বাবা বলতেন—চুপ, চেঁচিও না—

আমি বাবার কথা শুনে চেঁচাতুম না, কিন্তু লোকটার দিকে তাকাতুম।

* * *

সেদিন ঠিক হলো কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহল দেখা হবে। পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহলের আলাদা মেজাজ। সেদিন খুব ভীড় হয় তাজমহলের সামনে। কত লোক যে সেদিন সেখানে এসেছিল, তার ঠিক নেই। রাত যেন তখন দিন হয়ে গেছে সেখানে। সেদিন হোটলের ঘরের ভেতরে আর কেউ শোবে না। রাত দশটা-এগারোটার-বারোটা পর্যন্ত সবাই তাজমহল দেখবে। আবার কেউ-কেউ হয়তো সমস্ত রাতই পড়ে থাকবে তাজমহলের দাওয়ার।

দেখতে আমার বেশ লাগছিল। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, তা বুঝতে পারিনি। চারদিকে চেয়ে দেখলুম অনেক লোক চলে গেছে। পূর্ণিমায় চাঁদটা তখন আকাশের একপাশে ফ্যাকাসে হয়ে আসছে।

বাবা ঘড়ি দেখে বললেন—রাত এখন তিনটে—

আমার উঠতে ইচ্ছে না করলেও উঠতে হলো। ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা। সামনের বড়-বড় গাছগুলো তখন মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া জটা নিয়ে কার জন্যে যেন ওৎ পেতে বসে আছে। থমথমে আবহাওয়া। বাইরের দোকান-পাট, ফেরিওয়ালা, টাঙ্গা-এক্কা কোথায় যেন সব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। আমাদের ক্যালকাটা হোটেল বেশী দূরে নয়। হেঁটে যেতে বেশি সময় লাগে না। বাবা বললেন—বড্ড দেরি হয়ে গেছে তো? এত দেরী হয়েছে বুঝতেই পারিনি—একটা গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই—

কথা শুনে মনে হলো বাবাও যেন ভয় পেয়ে গেছেন। এত রাত হয়েছে কেউ টের পায়নি আমরা। বাবা, মা আর আমি হাঁটতে-হাঁটতে চলেছি। হঠাৎ দূরে দেখলাম, একটা টাঙ্গা আসছে আমাদের দিকে।

বাবা বললেন—ডাকো-ডাকো, ওই টাঙ্গাটাকে ডাকো। এত রাত্তিরে আর হেঁটে হোটেলে যাওয়া যাবে না—বাবার কথাটা শুনেই আমি টাঙ্গাটার দিকে দৌড়লুম।

খানিক দূরে যেতেই টাঙ্গাওয়ালার চেহারাটা দেখে একটু থম্‌কে গেলুম। ছেলেধরাদের সম্বন্ধে যে চেহারা কল্পনা করেছিলুম, ঠিক তাই। মাথায় পাগড়ি, মুখময় গোঁফ-দাড়ি, পরনে আলখাল্লা। আমার কেমন ভয় করতে লাগলো তাকে দেখে।

কিন্তু কিছু ভাববার সময় না দিয়েই টাঙ্গাওয়ালা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর একটা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে নিজের টাঙ্গায় তুলে নিলে। ঘটনাটা ঘটে গেল এক নিমেষে। টাঙ্গায় উঠে বসে আমি বাবাকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু তার আগেই আমার গলা টিপে ধরেছে আর তীর বেগে টাঙ্গার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে সুরু করে দিয়েছে!

সে কী ছুট! আমি হঠাৎ টাঙ্গাওয়ালার এই ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। পেছনে তখন বাবার চীৎকার শুনতে পাচ্ছি—খোকা—

কিন্তু আমি যে সে-ডাকে সাড়া দেব তার উপায় নেই। আমি গলা ছেড়ে চিৎকার করতে চাইলুম। মনে হলো টাঙ্গা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। কিন্তু ছেলেধরাটা আমাকে এক হাতে জোরে জাপটে ধরে আছে। আমি যে তার হাত থেকে ছাড়া পাবো, তারও উপায় নেই। সে টাঙ্গাটাকে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে চলেছে। সমস্ত আগ্রা তখন ঘুমে অসাড়। রাস্তায় একটা প্রাণী নেই। আর আগ্রাতে আমিও নতুন মানুষ। এর আগে জীবনে কখন আগ্রায় আসিনি। পুরো অচেনা জায়গা। কোথা দিয়ে কোন্ রাস্তা মাড়িয়ে যে সে আমাকে কোন্ দিকে কী উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছে, তাও বুঝতে পারছি না।

সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন আমার। ভয়ে আমি কাল্‌চে হয়ে গিয়েছি। আমি তখন বুঝতে পারছি যে আমি ছেলেধরার কবলে পড়েছি। আমার আর শক্তি নেই। আমাকে লোকটা কোথাও নিয়ে গিয়ে চোখ দু'টো অন্ধ করে দেবে, তারপর অন্য কোনও দূরের শহরে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসিয়ে আমাকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে। আমি রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে-বসে চেঁচাবো—বাবুরা, দয়া করে অন্ধকে একটা পয়সা দিয়ে যান—

অবস্থাটা ভালো করে ভাবতে গিয়ে আমি ভয়ে আরো শিউরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু কী করবো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সমস্ত রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। সেখানে আমার জানাশোনাও কেউ নেই। আমি কাকে ডাকবো? কে আমায় উদ্ধার করবে? আর গলা ছেড়ে ডাকবার ক্ষমতাও তো আমার নেই তখন!

বুঝতে পারছিলুম না আমি কোথায় যাচ্ছি। বুঝতে পারছিলুম না কোন্ দিকে সে আমায় নিয়ে চলেছে। দুঃখ হতে লাগলো কেন আমি বাবার কথা

শুনিনি। শুধু বাবা নয়, আমি তো কখনও কারো কথাই শুনিনি। টাঙ্গাটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, দেখতে-দেখতে শহর ছাড়িয়ে সেটা যেন গ্রামের মধ্যে ঢুকলো। চারদিকে আর পাকা বাড়ি একটাও নেই, শুধু মাটির বাড়ি। আর রাস্তাটাও কাঁচা। রাস্তার ওপর খানা-খোঁদল পেরিয় টাঙ্গাটা তীরবেগে ছুটছে, তাতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝাঁকুনি লেগে বেদম যন্ত্রণা হচ্ছে। শেষকালে মুখ থেকে লোকটার হাতটা জোর করে সরিয়ে চীৎকার করলুম—বা—বা—

কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোল না। উল্টো একটা বিকট হাসি হেসে উঠলো লোকটা। সেই হাসির শব্দে আমি আরো ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে আরো জোরে টাঙ্গাটা ছুটিয়ে দিলে। তখন আর কোনও দিকে তার জ্ঞান নেই। বন-বাদড়, খানা-খন্দ গর্ত-ডোবা কিছুই আর মানলে না সে। প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো তো ছুটতেই লাগলো। টাঙ্গাটাও ছুটছে আর আমিও তখন কিছু করতে না পেরে শুধু কাঁদছি। তারপর একটা উঁচু জঙ্গল-ঘেরা জায়গার ওপরে আসতেই টাঙ্গাটা নীচের খাদের ভেতরে উল্‌টিয়ে পড়ে গেল। তখন আমার আর জ্ঞান নেই। আমি আর কিছুই তখন টের পেলুম না।

* * *

যখন আমার জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি, সামনে বাবা-মা দাঁড়িয়ে। আর একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গলায় স্টেথিস্‌কোপ ঝোলানো ডাক্তার। কোথা থেকে কখন কে যে আমাকে হোটেলের ভেতরে তুলে এনেছে বুঝতে পারিনি। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই যেন সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

ডাক্তারবাবু বললেন—যাক্, এ যাত্রায় অল্পের ওপর দিয়ে গেল—

পাশেই ক্যালকাটা হোটেলের কিরণবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—এসব সেই রাজবাহাদুরের কাণ্ড—

বাবা বুঝতে না পেরে বললেন—রাজবাহাদূরের কাণ্ড মানে?

কিরণবাবু বললেন—রাজবাহাদুর নামে আগ্রায় সেকালে একজন টাঙ্গাওয়ালা ছিল, বুড়ো মানুষ, তার একমাত্র ছেলে একবার ঘোড়ার পায়ের চোট খেয়ে মারা যায়। তারপর থেকেই রাজবাহাদূর পাগল হয়ে গিয়েছিল—

ডাক্তারবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি টাঙ্গা চালাতে—

কিরণবাবু বললেন—কিন্তু যারা জানতো তারা আর রাজবাহাদুরের টাঙ্গাতে চড়তো না। শেষকালে পুলিশ তার লাইসেন্স্ কেটে দিয়েছিল—

বাবা বললেন—সর্বনাশ, তা···তারপর?

কিরণবাবু বললেন—তারপর পুলিস তার লাইসেন্স্ কেটে দিলে কী হবে, রাজবাহাদুর লুকিয়ে-লুকিয়ে গাড়ি বার করতো। শেষকালে যখন কিছুতেই সে শোনে না, তখন একদিন তাকে ধরে এখানকার জেলে পুরে দিলে। তারপর সেখানেই সে একদিন মারা যায়—

—মারা গেছলো ?

বাবা বললেন—মারাই যদি গেল তো আবার টাঙ্গা চালাতো কী করে ?

কিরণবাবু বললেন—ওই তো, মারা যাবার পর এক-একদিন হঠাৎ আবার রাজবাহাদুরকে অনেক রাত্তিরে তাজমহলের সামনে টাঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছোট ছেলে-পুলে দেখলেই তাকে ছোঁ মেরে টাঙ্গায় তুলে নিয়ে উধাও হয়। তারপরে সকাল বেলা দেখা যায় ছেলেটা গাঁয়ের কোনও রাস্তায় মরে পড়ে আছে। এই রকম অনেকগুলো ছেলে এখানে মারা গেছে, পুলিশ তার কোনও কিনারা করতে পারেনি। আর পুলিশ ভূতের কী-ই বা কিনারা করবে !

বাবা তখন অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—ভূত ?

কিরণবাবু বললেন—হ্যাঁ ভূতই তো। ভূত না হলে এই কাণ্ড কেউ করে ? রাজবাহাদুরের নিজের ছেলে মারা গিয়েছিল তো সেইজন্যেই এখন ভূত হয়ে পরের ছেলে চুরি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাই তো আপনাকে গোড়াতেই বলেছিলুম, একটু সাবধানে ঘোরাঘুরি করবেন।

—কিন্তু আপনি তো গুণ্ডার কথা বলেছিলেন !

কিরণবাবু বললেন—তা মানুষই বুঝি শুধু গুণ্ডা হয়, ভূত বুঝি আর গুণ্ডা হতে পারে না ?



বড় ভালো লাগে

এটা কি গল্প বলা যায় ? কিন্তু সম্পাদকের কাছ থেকে গল্প লেখবার নির্দেশই যে এসেছে আমার কাছে। তবে যিনি আমাকে গল্পটা বলেছিলেন, তিনি কিন্তু এটাকে গল্প বলতে চান নি। বলেছিলেন—এটা সত্যি ঘটনা। তা সত্যি তো গল্প হতে পারে। সব গল্পই মিথ্যে, এমন কথা কোনো গল্পকারই হলফ্ করে বলতে পারেন না। সব গল্পের পেছনেই এক কণা সত্য মিশে থাকে। সেই এক কণা সত্যকে সকলের মনের মত করে পরিবেশন করার আর এক নামই তো গল্প। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

আজ থেকে চার বছর আগে সরকারী একটা সেমিনারে যোগ দিতে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম। সেমিনারটা গৌণ, কিন্তু যেটা মুখ্য সেটা হলো দেশ-ভ্রমণ।

সেই দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষেই একজন গাইড পেয়ে গিয়েছিলাম। গাইড মানে পেশাদার গাইড নয়, একজন সাহিত্য-ভক্ত মানুষ। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি বললেন ..তাঁর নাম গুণডাপ্পা স্বামী। গুণডাপ্পা স্বামীর বয়েস কম, কিন্তু অভিজ্ঞতা বেশি। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের প্রজ্ঞা আসে। সেই প্রজ্ঞা পেতে হলে যে লোকের অভিজ্ঞতা বেশি, তাদের সঙ্গেই সাধারণত মেলা-

মেশা করি। রবীন্দ্রনাথকে সে-যুগের তরুণ সাহিত্যকরা 'বুড়ো'-'বুড়ো' বলে গালাগালি দিয়ে ছোট করবার চেষ্টা করতো। তাই তিনি লিখে গিয়েছেন, 'যে দেশের লোক অল্প বয়সেই মারা যায়, প্রবীণ বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য তো ঘোড়া, আর প্রবীণতাই তার সারথি। সারথিহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিঘ্ন বিপদ ঘটিতে পারে, আমরা মাঝে-মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি'।

আমার গাইড গুণডাপ্পা স্বামী বয়েসে না হলেও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে প্রবীণ। তাঁর মাতৃভাষা কন্নাড়, আর আমার বাংলা। তাই কথাবার্তা যা কিছু হয়েছিল সব ইংরেজির মাধ্যমেই। তিনি আমাকে নানা জায়গা দেখালেন, নানা ইতিহাস শোনালেন। মহীশুরেও গেলাম তাঁর সঙ্গে। 'ললিতা-প্যালেস,' 'বৃন্দাবন গার্ডেনস' কোনো জায়গা দেখাতেই তিনি বাকি রাখলেন না।

সব দেখানো পর বললাম—এখানকার কিছু জিনিস কিনে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। বলুন কি কিনবো?

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—চলুন, আপনাকে এখানকার শ্রীধরণের দোকানে নিয়ে যাই—

—শ্রীধরণ? তাঁর কীসের দোকান?

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—শ্রীধরণ সৌখীন জিনিসপত্তোরের কারবার করে। এখানে যাঁরাই আসে, শ্রীধরণের দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যায়। শ্রীধরণের দোকানের জিনিস সস্তাও বটে, আবার দেখতেও সুন্দর—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—একটা আশ্চর্যের কথা শুনবেন?

তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। বললাম—কী?

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—আশ্চর্যের কথা এই যে একদিন এই শ্রীধরণ ভিক্ষে করে বেড়াতো। এমন দিন তার গেছে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছুই পেটে পড়েনি। শুধু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে— আর আজ ক'বছরের মধ্যেই একেবারে কোটিপতি হয়ে গিয়েছে—

—কী করে হলো?

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—সে এক কাণ্ড, এক ভদ্রলোক তখন এই বাঙ্গালোরে থাকতেন, তার নাম হয়ত শুনেছেন। তিনি হচ্ছেন ভি. পি. মেনন।

—কোন ভি. পি, মেনন? সেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সেক্রেটারি!

—হ্যাঁ।

বললাম—সে কী? তাঁর নাম শুনবো না? তাঁর নাম তো ইণ্ডিয়ার সবাই জানেন—

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—হ্যাঁ, সেই ভি. পি. মেনন রিটায়ার করে এই বাঙ্গালোরে থাকতেন। এককালে বড় কষ্ট গেছে তাঁর। খুব গরীব লোকের ছেলে ছিলেন তিনি। তেরো বছর বয়েস পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছেন, তারপরে পয়সার অভাবে আর লেখা পড়া হয়নি তাঁর। পয়সার অভাবে ইস্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছে। কত দিন যে জীবনে খেতে পাননি, তার ঠিক নেই।

আমি মিস্টার ভি. পি. মেননের নামই শুনেছি, তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। গুণডাপ্পা স্বামীর গাড়িতে যেতে-যেতে সেই কাহিনীই বলতে লাগলেন। ছোটবেলা থেকে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ পড়ার একটা নেশা ছিল আমার। এমন কোনও পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্যিক-কবি নেই, যার জীবনী আমি পড়ি নি। কিন্তু রাজনীতিবিদ্?

মনে আছে, গ্রামের অখ্যাত অবজ্ঞাত কোনও লোকের লেখা ছাপানো আত্মজীবনীও কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনে পড়েছি, আর অসাড় আনন্দ পেয়েছি। বিখ্যাত লোকের জীবনী হলেই যে তা ভালো বই হবে, তার কোনও মানে নেই। এমন-এমন অখ্যাত লোকের জীবনীও পড়েছি, যা বিখ্যাত লোকের জীবন থেকেও বেশি সুখপাঠ্য আর শিক্ষাপ্রদ। আমার গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে সেগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছি।

তা ভি. পি. মেনন ছোটবেলাতেই বিখ্যাত ছিলেন না। বিখ্যাত হয়েছেন পরে, কিন্তু সেই ছোটবেলাকার মেনন সাহেবকে ক'জন জানে?

কিন্তু মেনন সাহেবকে জানতে হলে ১৯৪৭ সালের আগেকার ভারতবর্ষকে জানতে হবে। সেই ইংরেজ আমলের পরাধীন ভারতবর্ষ! আর জানতে হবে ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে, জহরলাল নেহেরুকে, বল্লভ ভাই প্যাটেলকে, মহম্মদ আলি জিন্নাকে, আর জানতে হবে মহাত্মা গান্ধীকে। সব কথা বলতে গেলে একটা ছোট গল্পে তা মানাবে না। তাই গুণডাপ্পা স্বামী যখন ভি. পি. মেনন সাহেবের কথা বললেন, তখন আমার সেই সব দিনের কথাই মনে পড়লো।

সবাই বলতো—ছোঁড়াটার জীবনে আর কিসসু হবে না---

কী করে হবে? মাথার ওপর দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, গরীবের চেয়েও গরীব, যার ঘাড়ের ওপর এগারোটা ভাই-বোন, যার লেখাপড়া হয়নি। তেরো বছর বয়সের পর থেকে যে কখনও ইস্কুলের মুখ পর্যন্ত দেখেনি, তার যে কোনও দিন কিছু হবে, এ-কথা তখন কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু তখন সংসারের এমন অবস্থা যে টাকা উপায় না করলে আর চলে না। হাতে কিছু টাকা না এলে সংসারের সবাই উপোস করে মরবে।

এমন সময় একটা সুযোগ এল যখন একটা বাড়ি তৈরি করার জন্যে এক ইঞ্জিনীয়ারের কিছু মজুর দরকার। হ্যাঁ, মজুর বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। রোজ হিসেবে মাইনে। একদিন কামাই করলে মজুরিও বন্ধ।

তা তা-ই সই! টাকার অভাবে যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই-ই গ্রহণ করতে হবে। ভিখিরির কাছে পছন্দ-অপছন্দের বালাই নেই! কিন্তু কিছু দিন কাজ করবার পর তাও গেল। তখন উপায়?

এর পর কয়লার খনিতে একটা মজুরের কাজ জুটে গেল। কিন্তু বেশিদিন সে কাজও থাকলো না। তারপর কাজ জুটলো একটা কারখানায়। বড় কষ্টের কাজ। কিন্তু মেনন সাহেব তাতেই রাজী। যেমন করে হেকে দু'টো পয়সা উপায় করতে হবে। কিন্তু ভাগ্য যার প্রতিকূল, তার কাজ বেশিদিন চলবে কী করে? সুতরাং একদিন সে-কাজও গেল।

তারপর আর একটা কাজ। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের ইঞ্জিনের খালাসী। চলন্ত ইঞ্জিনের বয়লারে কয়লা ভাঙতে হবে। ভগবান বোধহয় সবদিক থেকেই তাঁকে পরীক্ষা করে নিতে চান।

তারপরে এলো আর একটা কাজের সুযোগ। শেয়ার মার্কেটের তুলো কেনা-বেচার দালালি। আসলে পয়সা উপার্জন নিয়ে কথা। তখন পয়সা পেলে সব কাজ করতেই রাজি ভি. পি. মেনন।

এর পরে বাকি ছিল শুধু আর একটা সুযোগ। ইস্কুল-মাস্টারি। যে-মানুষ নিজে বেশিদিন ইস্কুলে যায়নি, সে-ই শেষকালে কিনা পেলে একটা ইস্কুল-মাস্টারের চাকরি! সেই সময়ে নিজের চেষ্টায় টাইপ-রাইটিং মেশিন নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। প্রথম দিকে একহাতের টাইপ করা, আর শেষকালে দু'হাতে টাইপ করতে শেখা। যেদিন দু'হাতে ভালভাবে টাইপ করতে শিখলেন, সেইদিন থেকে চাকরির জন্যে দরখাস্ত করতে লাগলেন। সব দিক থেকেই উত্তর আসে---না, চাকরি খালি নেই—

উদ্যোগী পুরুষেরা কখনও পরাজয় স্বীকার করে না। তাই দিল্লীর সচিবালয়ে একদিন কনিষ্ঠ কেরানীর একটা চাকরি পেয়ে গেলেন ভি, পি, মেনন সাহেব। সেই তখন থেকেই মেনন সাহেবের ভাগ্য ফিরে গেল—

জিজ্ঞেস করলাম---কী রকম?

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন সে এক আশ্চর্য কাণ্ড স্যার। বললে, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না স্যার যে, বলতে গেলে হিন্দুস্থানে কত আই-সি-এস কত লেখা-পড়া জানা অফিসার ছিল, তাদের বাদ দিয়ে মেনন সাহেবের হাত দিয়েই কি না আমাদের এই দেশ স্বাধীন হলো...

বললাম---তার মানে ?

গুণডাপ্পা গল্প বলেছেন, আর গাড়িটা ফুল ফোর্সে এগিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য শ্রীধরণের দোকানে যাওয়া। কিন্তু শ্রীধরণের দোকানে যাওয়াটা গৌণ হয়ে উঠলো। মুখ্য হয়ে উঠলো ভি. পি. মেনন আর তাঁর কাহিনী।

গুণডাপ্পা স্বামী বললেন—আমাদের দেশে তো বড়-বড় সাহেবরা কমতি নেই, কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটের সাহেব যখন ভাইসরয় হয়ে এলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার ক্লিমেণ্ট এ্যাট্‌লী। তিনি কত লোক থাকতে বেছে-বেছে শুধু লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেই ইণ্ডিয়ায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য ইণ্ডিয়াকে যখন আর পরাধীন রাখা যাবে না, তখন এমন একজনকে ভাইসরয় করে ইণ্ডিয়ায় পাঠাও যে ভারতবর্ষকে শুধু স্বাধীনতাই দেবে না, সঙ্গে-সঙ্গে সেই ভারতবর্ষ বৃটেনকে বন্ধু হিসেবেই চিরকাল স্মরণ করবে, এমন ব্যবস্থা করতে পারবে। লুই মাউন্টব্যাটেন ছাড়া এ-কাজ আর কে করতে পারবে। আর কার দ্বারাই বা এ-কাজ করা সম্ভব হবে ?

আর সেই ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়া মানে কী ?

ইণ্ডিয়া মানে মিস্টার গান্ধী। চার্চিলের বলা সেই 'হাফ্‌-নেকেড্‌ ফকির' ; তার চেলা জহরলাল নেহেরু, আর একদিকে মহম্মদ আলি জিন্না আর তার চেলা-চা-মুণ্ডারা। তাদের সঙ্গে কোনরকম একটা মিটমাট হলেই ইণ্ডিয়া কমনওয়েলথের সঙ্গে জুড়ে থাকবে। আর তখন স্বাধীন ইণ্ডিয়ার সঙ্গে এখন যেমন কারবারী লেন-দেন চলছে, তেমনি তখনও চলবে।

লুই মাউন্ট-ব্যাটেন ইণ্ডিয়ায় এসে এখানকার হাব-ভাব বুঝে নিলেন। তিনি জানতেন যে টাক মাথা ওয়ালা যে বুড়ো লোকটি ইণ্ডিয়ায় আছে, ওকে নিজের বশে আনাই সব চেয়ে শক্ত। আগেকার প্রাইম মিনিস্টার চার্চিল ওই টাক-মাথাওয়ালা লোকটাকেই সবচেয়ে ভয় করতো। যতবার ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলেছেন, ততবারই ও লোকটা একটাই জবাব দিয়েছে। যে জবাবটা হচ্ছে—'না'। শুধু চার্চিলের কথাতেই নয়, সকলের সব কথাতেই ওই লোকটা কেবল একটাই কথা বলেছে, বলেছে 'না'।

ও-লোকটাকে দিয়ে যে 'হ্যাঁ' বলানো যাবে না, এ-কথা শুধু চার্চিল নয়, এ্যাট্‌লীও জানতেন। তাই ওই সবচেয়ে শক্ত কাজটা আর কাকে দিয়ে করানো যাবে ? অনেক ভেবেচিন্তে লুই মাউন্ট-ব্যাটেনের নামটাই সব চেয়ে আগে সকলের মাথায় এসেছে। যে লোকটা জার্মানী আর জাপানের সঙ্গে লড়াইতে অত ক্ষমতা দেখিয়েছে, একমাত্র তার দ্বারাই এ-কাজটা করা হয়তো সম্ভব হবে। লুই মাউন্টব্যাটেন ওদিকে লণ্ডন থেকে যেদিন উড়ে ইণ্ডিয়ায়

এলেন, সেদিনও তিনি জানতেন না যে ওই টাক মাথাওয়ালা লোকটাকে কাবু করা এত সহজ হবে।

এখানে এসে তিনি দেখলেন যে, কংগ্রেসের যত বড়-লীডার সবাই তাঁর দিকে। নেহেরু, প্যাটেল সবাই। ওই টাক-মাথাওয়ালা লোকটা কিন্তু তখন তাঁর বিকেল-বেলার প্রার্থনা সভায় রোজ বলে চলেছেন—যদি সমস্ত দেশে আগুন লেগে যায়, যদি সব মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবু এক ইঞ্চি জায়গাও আমি পাকিস্তানের জন্যে দেব না—তাতে যা ফল হয় হোক—

কিন্তু কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে তখন প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেছে যে দেশ-বিভাগে কমিটি রাজি। টাক মাথাওয়ালা লোকটি কিন্তু তখন বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সকাল বেলায় বেড়াতে-বেড়াতে তিনি একজনে বললেন—দেখছি সবাই আমার ছবিতে আর আমার মূর্তিতে ফুলের মালা পরাতে ব্যগ্র, কিন্তু আমার উপদেশ কেউ শুনতে চায় না ...

একদিন রাত্রে অন্য দিনের চেয়ে আধঘণ্টা আগে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে শুয়ে ছিলেন মনু গান্ধী। তিনিও জেগে উঠলেন। শুনলেন গান্ধীজী আপনমনেই বিড়-বিড় করে বলছেন...আজ আমি একবারে একলা পড়ে গিয়েছি। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। প্যাটের-নেহরু ত্ব'জনেই বিশ্বাস করে দেশকে ত্ব'ভাগ করলেই নাকি আবার শান্তি ফিরে আসবে। আশ্চর্য...

লুই মাউন্টব্যাটেন ঝানু লোক। তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসে টের পেলেন। বুঝতে পারলেন, ওই টাক-মাথাওয়ালা মানুষটাকে তার নিজের দলেন নেতারাও আজ ত্যাগ করেছে। মনে-মনে হাসলেন তিনি। সে এক স্বার্থসিদ্ধির অদৃশ্য হাসি। সেইদিনই তিনি কাজে গেলে গেলেন। মনে-মনে ঠিক করলেন, তাঁকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

কিছু দিন ধরেই তিনি তাঁর সচিবালয় থেকে একজন সুদক্ষ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। সে এমন একজন লোক হওয়া চাই, যে বিশ্বস্ত আর আর দক্ষই শুধু নয়, তার ওপর তাঁকে অক্লান্ত-কর্মা আর রাজনীতিজ্ঞ হতে হবে। তেমন লোক তিনি কোথায় পাবেন? সেক্রেটারীর অভাব নেই তাঁর দফ্‌তরে। অনেক ইংরেজ আর ইণ্ডিয়ান আই-সি-এস আছেন। কিন্তু কাউকেই তাঁর পছন্দ হলো না।

তিনি তাঁদের কাউকেই তাঁর প্রয়োজনের উপযুক্ত বলে মনে করলেন না। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি খুঁজে বার করলেন, এমন একজন লোককে যিনি ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি। যিনি প্রথম জীবনে টাইপিস্ট হয়ে দফতরে ঢুকেছিলেন। আর আশ্চর্য সে লোকটি আর কেউ নন, তিনি হলেন এই

বাঙ্গালোরের ভি, পি, মেনন।

লুই মাউন্টব্যাটেন তখন সিমলা পাহাড়ে গিয়েছেন। দিল্লীর আবহাওয়া তখন গরম। শুধু সূর্য-কিরণে যে গরম তা নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও গরম। সেই মাউন্টব্যাটেন দিল্লি থেকে ডেকে পাঠালেন ভি, পি, মেনকে। যে-রাজনৈতিক জটিলতার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ভি, পি মেননের মতো একজন সেক্রেটারী প্রয়োজন অনিবার্য।

বড়লাট সাহেবের ডাক পেয়ে মেনন সঙ্গে-সঙ্গে তৈরী হয়ে নিয়ে দিল্লির রওনা দিলেন। আর সময় নেই হাতে। যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়িই হোক সিমলা পাহাড়ে গিয়ে বড়লাটের দরবারে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর পকেটের মানিব্যাগ কই?

সে কি খোয়া গেল? হয়তো তাড়াতাড়িতে বাড়িতেই ফেলে এসেছেন।

কিন্তু সিমলায় যাবার ট্রেন ভাড়া কোথায় পাবেন?

হঠাৎ নজর পড়লো একজন শিখ-ভদ্রলোকের ওপর।

তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—স্যার, একটু অনুগ্রহ করবেন?

ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন, কী?

—স্যার, আমাকে পনেরোটা টাকা ধার দিতে পারেন?

ভদ্রলোক তো আরো অবাক। চেনা নেই, জানা নেই, শোনা নেই কিন্তু টাকা ধার চেয়ে বসেছে লোকটা! তবু জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ একটাকা, দু'টাকা নয়, একেবারে পনেরো টাকা চাইছেন কেন?

ভি, পি, মেনন বললেন—দিল্লি থেকে সিমলা যাওয়ার ট্রেন-ভাড়া যে পনেরো টাকা। আমার মানিব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে, তাই ··

শিখ-ভদ্রলোকটিকে খুবই সদাশয় বলে মনে হলো। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে পনেরোটা টাকা দিয়ে দিলেন ভি, পি, মেননের হাতে।

ভি, পি, মেনন তখন টাকা ক'টা নিয়ে পকেটে রেখে দিয়েছেন। আর নোটবই আর কলম বার করে বললেন—আপনার ঠিকানাটা যদি বলেন, তাহ'লে ভালো হয়। আমি আপনার ঠিকানায় মানিঅর্ডার করে পনেরোটা টাকা পাঠিয়ে দেব—

শিখ ভদ্রলোক বললেন, তার দরকার নেই। তার বদলে আপনি একটা কাজ করবেন।

—কী কাজ বলুন?

শিখ ভদ্রলোক বললেন, যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন যে কোনও সত্যিকারের অভাবী লোক আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসবে, তাকে

আপনি প্রত্যেক বার পনেরো টাকা করে ভিক্ষে দিয়ে যাবেন। তাহ'লেই আপনার এই ধার শোধ হয়ে যাবে।

তখন আর বেশি কথা বলার সময় ছিল না, কারণ ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। তার আগে টিকিট কিনতে হবে। আর তাছাড়া লুই মাউন্টব্যাটেন তখন তার জন্যে সিমলার লাটপ্রাসাদে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন। তারপর জহরলাল নেহরুজীও সিমলায় তাঁর প্রাসাদে গিয়ে অতিথি হয়ে আছেন। নেহরুজীর সঙ্গে ভি, কে, কৃষ্ণ মেননও আছেন। অত্যন্ত জরুরী কাজ। এক মিনিট দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা ভবিষ্যতে কী চেহারা নেবে, সেটা ভি, পি, মেননের লেখা বয়ানের ওপরই তো নির্ভর করবে!

* * *

গাড়িটা বাঙ্গালোরের লালবাগ অঞ্চলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল।

গুণডাপ্পা স্বামী আবার বলতে লাগলেন, তারপরের ঘটনা আপনারা সমস্তই জানেন। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেল সেই ভি, পি, মেমন সাহেবের নিজের হাতের লেখা ড্রাফ্‌টের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো বাইরের লোকরা বিশেষ কিছু জানে না। মেনন সাহেব তারপরে যতদিন চাকরি করেছিলেন, ততদিন যে-কেউ তার কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছে, তিনি তাঁকে পনেরো টাকা করে দান করে গেছেন। তারপর চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাঙ্গালোরে যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন সেই পনেরো টাকা করে দিয়ে গেছেন সবাইকে। সেই শিখ ভদ্রলোকের কথা তিনি জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেছেন। এ-রকম অদ্ভুত সত্য-নিষ্ঠতা কি আর কেউ আর কোথাও দেখতে পেয়েছেন?

এই আমাদের শ্রীধরণের ব্যাপারটাই দেখুন না। বেচারীর অল্প বয়সে বাপ-মা মারা গিয়ে ওদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছিল। শেষকালে একদিন এমন অবস্থা হলো, যে ও খেতেই পায় না। তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে শ্রীধরণ বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে পেট চালাতে লাগলো। কেউ কিছুই দিল না, কেউ বা কালে ভদ্রে দয়া করে দু'আনা, চার আনা পয়সা দিলে। তারপর একদিন মেনন সাহেবের বাড়িতে গিয়ে নিজের অবস্থা জানালে। শ্রীধরণের কথা শুনে মেনন সাহেব প্রত্যেকবারের মতো তাকেও একসঙ্গে পনেরো টাকাই দিয়ে দিলেন।

আসলে শ্রীধরণ একসঙ্গে এতগুলো টাকা জীবনে কখনও দেখেনি। টাকা ক'টা পেয়ে শ্রীধরণ ভাবলে এত টাকা নিয়ে সে-কীকরবে? সব

টাকা কি খেয়েই ফুরিয়ে দেবে ?

ভেবে-ভেবে শেষকালে সে একটা পথ বার করলে। দু'টাকা মুঁগফলী, মানে চিনেবাদাম, কিনে সে রাস্তায়-রাস্তায় ফেরি করে বেড়ালো। তাতে নিজের খাওয়া-খরচ কেটে বাকি আট আনা হাতে রইলো। তার পরদিন আবার ওই রকম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রতিদিন আট আনা করে জমতে লাগলো। সে যে কী আনন্দ! রোজ আট আনা করে জমালে মাসে কত টাকা হয়? বছরে কত হয়? আর পাঁচ বছরেও বা কত টাকা হয়? সব হিসেব করতে গিয়ে তখন শ্রীধরণের মাথা ঘুরতে লাগলো। সেইসব জমানো টাকা দিয়ে এখন কী করবে সে ?

অনেক ভেবে শ্রীধরণ একটা দোকান-ঘর ভাড়া নিলে। অল্প ভাড়া জায়গাও কম। কিন্তু আশ্চর্য, খুব খদ্দের আসতে লাগলো দোকানে সওদা করতে। দোকানের বেশ সুনাম হতে লাগলো চারিদিকে। তারপর এত খদ্দের হতে লাগলো যে, সেই ছোট দোকানে আর কুললো না। আর একটা বড় দোকান ঘর ভাড়া বরলে সে। ভাবলে দোকানটার নাম দেবে···"ভি, পি, মেনন স্টোর্স"। আর সে দোকানটা শ্রীধরণ উদযাটন করাবে ওই ভি, পি, মেনন সাহেবকে দিয়ে, যিনি তাঁর দুঃখের দিনে পনেরো টাকা ভিক্ষে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে পাপ হবে। সেইদিনই সে ভি, পি, মেনন সাহেবের বাড়ি গেলেন। বাইরে থেকে সদর দরজার কড়া নাড়তেই এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি শ্রীধরণকে জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই ?

শ্রীধরণ বললে নিজের সমস্ত কথা। বললে কী-ভাবে একদিন পনেরো টাকা ভিক্ষে দিয়েছিলেন মেনন সাহেব, এবং সেই টাকার সাহায্যে কী ভাবে সে কোটিপতি হয়েছে এখন। এবং আরো জানালে যে, সে নতুন বড় দোকানটার নাম দিয়েছে "ভি, পি, মেনন স্টোর্স"।

মহিলাটি বললে, কিন্তু তিনি তো আর বেঁচে নেই। মাসখানেক আগেই তিনি মারা গেছেন। কথা ক'টা যেন বজ্র হয়ে শ্রীধরণের মাথার ওপর পড়লো। শ্রীধরণ আর কিছু কথা না বলে সেখান থেকে সোজা ফিরে চলে এলো নিজের বাড়ির দিকে। আর কান্নায় একেবারে খান-খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

* * *

হোটেলে ফিরে আসতে সেদিন একটু দেরিই হলো। ফিরে আসতেই গঙ্গা-শরণ সিংজী বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনি ? আমাদের যে টি-পার্টি ছিল অশোকা হোটেলে। সেখানে সবাই হাজির, শুধু আপনিই গর-হাজির।

আমি সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললাম, যেখানে গিয়েছিলুম সেখান থেকে চা খেয়ে এসেছি। "ভি, পি, মেনন স্টোর্স" যে চা না খাইয়ে ছাড়লে না।

গঙ্গাশরণ সিংজীকে সারা ভারতবর্ষের লোক চেনে। হিন্দী সাহিত্যের প্রচারে তিনি নিজের জীবন দিয়েছেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন বরাবর। আমার কথা শুনে তিনি আরো অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, 'ভি, পি, মেনন স্টোর্স'-এ আপনি গিয়েছিলেন কী করতে ?

বললাম, গুণডাপ্পা স্বামী বলে এক সাহিত্য-ভক্ত ভদ্রলোক আমাকে শ্রীধরণের বিচিত্র জীবনের গল্পটা শুনলাম। বড় অদ্ভুত জীবন ওই শ্রীধরণের।

গঙ্গাশরণ সিংজী বললেন, ওই গুণডাপ্পা স্বামী আর শ্রীধরণ তো একই লোক, তা বুঝি জানেন না ?

বললাম, সে কী ?

—হ্যাঁ, গুণডাপ্পা স্বামীরই পুরো নাম শ্রীধরণ গুণডাপ্পা স্বামী।

এবার আমার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা। বললাম, কিন্তু উনি তো তা একবারও বললেন না !

গঙ্গাশরণ সিংজী বললেন, তা কেন বলবেন ? ছেলেটি খুবই বিনয়ী। সেদিন ভি, পি, মেনন সাহেব ওই পনেরোটা টাকা গুণডাপ্পা স্বামীকে না দিলে ও তো অভাবের চোটে আত্মহত্যা করেই বসতো। দেখুন ভি, পি, মেনন সাহেব তো সারাজীবন, কত লোককেই পনেরো টাকা করে ভিক্ষে দিয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের ক'জন লোক আর মেনন সাহেবকে মনে রেখেন ? কেবল ওই গুণডাপ্পা স্বামীই শুধু পনেরো টাকার ভিক্ষের ঋণ এই ভাবে সারা জীবন ধরে শোধ করে চলেছে।

বললাম, কিন্তু সে-কথা তো একবার ঘুণাক্ষরেও আমাকে বললে না।

গঙ্গাশরণ সিংজী বললেন, বলবেন কেন ? ভয় তো করছে, যে শেষকালে হয়তো আপনি ওকে নিয়ে গল্প লিখে ফেলবেন।

বললাম, আমি যে লেখক, তা ও জানবে কী করে ?

গঙ্গাশরণ সিংজী বললেন, এত কাজের ফাঁকেও যে শ্রীধরণ রাত জেগে বই পড়ে। আপনার এত বই কন্নাড় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, আর ও কি তার একটিও পড়েনি বলতে চান ?

আমরা সেইদিনই সন্ধ্যের গাড়িতে সদলবলে সবাই বাঙ্গালোর ছেড়ে তামিলনাড়ুর দিকে যাত্রা করেছিলাম। নইলে আবার হয়তো পরের দিনেই 'ভি, পি, মেনন স্টোর্সে' গিয়ে গুণডাপ্পা স্বামীকে গিয়ে প্রণাম করে আসতুম। কারণ এ-যুগে তো উপকারের কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করার রীতি উঠে গেছে।



জ্যান্ত ভূতের গপ্পো

ভূতের গল্প আমি অনেক শুনেছি। ভূতের গল্প বইতে পড়েছিও অনেক। পড়তে ভালো লেগেছে সেগুলো, কিন্তু ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস কখনও হয় নি। নিজেও কখনও ভূত দেখি নি। তাই ভূতের গল্প শুনে ভয় পাই না। ভেবেছি ও-সব গাল-গল্প।

কিন্তু জীবনে একবার ভূত দেখেছিলাম। একেবারে জ্যান্ত ভূত।

সেই জ্যান্ত ভূতের কথা ভাবলেই এখনও ভয়ে গা ছম্-ছম্ করে। মনে হয়, যারা ভূতের গল্প বিশ্বাস করে না, তাদের গল্পটা শোনাই। ভূত দেখার ঘটনা সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ। এবার ঘটনাটা বলি।

আমরা চার বন্ধু দিনের মধ্যে সব সময়ে প্রায় এক-সঙ্গেই থাকতুম। আমি, শতদল, বঙ্কু আর ভূতো। আমরা তিনজনে একই পাড়ায় থাকতুম, আর ভূতোর কেউ ছিল না। তাই সে থাকতো ভবানীপুরের একটা মেসে। আমরা চারজনেই একটু ডানপিটে স্বভাবের ছেলে ছিলুম। মড়া পড়ানো আমাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। তা ছাড়া যাত্রা-থিয়েটারের দল ছিল আমাদের। রাত জেগে-জেগে আমরা যাত্রা-থিয়েটার করতুম বলে আমাদের বাড়িতে বকুনি খেতে হতো খুব। তা আমরা সে-সব কথায় কেয়ার করতুম না।

আর ভূতো? ভূতোর এক পিসেমশাই থাকতো গ্রামে। সেখান থেকে মনি-অর্ডারে ভূতোর নাকে টাকা আসতো লেখা-পড়ার খরচ চালাবার জন্যে। যাত্রা করে যখন বাড়ি ফিরতুম, তখন অনেক রাত হয়ে যেত। সেদিন আর ভূতো তার ভবানীপুরের মেসে ফিরে যেতে পারতো না। আমাদের কারো বাড়িতেই শেষ রাতটা শুয়ে কাটাতো, তারপর ভোর হতেই আবার হেঁটে-হেঁটে তার মেসে চলে যেত।

আমাদের বাবা-মা'রা জেনেই গিয়েছিল যে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই আমরা যা খুশী, তাই করতাম। কারোর উপদেশ বা আদেশ শুনতুম না। এমনি করে যখন আমরা আড্ডা দিয়ে বেড়াতুম, তখন একদিন রাত দু'টোর সময় ভূতো আমাকে ডাকতে এল। আমি তখন বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছি। ভূতো এসে বাইরে থেকে আমায় ডাকতে লাগলো।

ভূতোর গলা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে।

জানালা খুলে বললাম, কে-রে? ভূতো?

ভূতো বললে, হ্যাঁ, একবার বাইরে আয়, খুব জরুরী একটা দরকার আছে।

আমি বাইরে এসে বললাম, কী রে, এত রাত্তিরে কী জরুরী দরকার?

ভূতো বললে, তুই একটা গামছা নিয়ে আয়, শ্মশানে যেতে হবে। আমাদের মেসের করুণাদা মারা গেছে।

করুণাদা মানে করুণাকান্ত বিশ্বাস। ভূতোদের মেসে থাকতো। আর কলেজে পড়তো। আর শনিবার-শনিবার দেশে যেত, আর রবিবারটা সারাদিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার সকালে এসে আবার কলেজ করতো।

বললাম, আজ তো শনিবার, করুণাদা দেশে যায় নি?

ভূতো বললে, না, শরীরটা খারাপ ছিল বলে দেশে যায় নি।

বললাম, কীসে মারা গেল?

ভূতো বললে, হার্টফেল করে। মেসের অন্য লোকেরা কেউ নেই, সবাই যে-যার দেশে চলে গেছে। শ্মশানে যাবার লোক পর্যন্ত কেউ নেই, তাই তোদের ডাকতে এসেছি। এখন শতদল আর বঙ্কুর বাড়িতে গিয়ে তাদেরও ডাকতে হবে।

এ'রকম ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে। মড়া-পোড়ানোকে আমরা একটা সমাজ-সেবা বলে মনে করতুম। পৃথিবীতে যাদের কেউ নেই, তাদের জন্যে আমরা ছিলুম আপন-জন।

বাড়ির ভেতর থেকে একটা গামছা নিয়ে এসে বললুম, চল।

আমি আর ভূতো শতদলের বাড়িতে গেলুম। তাকে ডাকতে সেও একটা গামছা নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর গেলুম বঙ্কুর বাড়িতে। সেও গামছা নিয়ে তৈরী হয়ে বাইরে এল।

শীতকালের রাত। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। আমরা চারজন সেই ঠাণ্ডাতে হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে চললাম ভবানীপুরে ভূতোদের মেসের দিকে। আমি ভূতোকে জিজ্ঞেস করতাম, হ্যাঁ রে, করুণাদার বাড়িতে একটা খবর দিয়েছিস্ তো?

ভূতো বললে,করুণাদার বাবাকে কাল একটা টেলিগ্রাম করে দেব'খন—কিন্তু তারা টেলিগ্রাম পেতে-পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই আর অপেক্ষা করতে চাই নি। দেশে করুণাদার থাকার মধ্যে আছে মাত্র এক বুড়ো বাবা। কিন্তু বুড়ো মানুষ কি এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে ? করুণা-দার ভাই-বোন তো কেউ নেই।

আমরা ভাবতে লাগলুম, তা-বটে! ততক্ষণ অপেক্ষা করলে চলবে না। তাই দাহ-কর্মটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভালো।

প্রথমে আমরা গেলুম একটা দড়ির খাটিয়া কিনতে। দামটা ভূতোই দিলে। সেই খাটিয়া মাথায় করে নিয়ে ভূতো আগে-আগে চলতে লাগলো।

ভূতোদের মেস্‌টা একটা একতলা বাড়িতে। আমরা আগে অনেকবার ভূতোদের মেসে এসেছি। চারজন ছেলে থাকতো একটা ঘরে। ঘরটাও ছোট। বাড়িটাও পুরোনো। পালা করে সবাই রান্না-বান্না করে খেত।

আমরা যখন বাড়িটার ভেতরে গেলাম, তখন দেখি করুণাদার মৃতদেহটা এককোণে চাদরে মুখ ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে। ভূতো বললে, আয়, আমরা সবাই মিলে করুণাদাকে ধরে খাটিয়ার ওপরে তুলি।

করুণাদা এমনিতেই পাতলা মানুষ, বেশী মোটা-সোটা নয়। আমাদের তুলতে বেশী কষ্ট হল না। তারপর ভূতো ঘরটার সদর-দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে বললে, এইবার খাটিয়াটা কাঁধে তোল্ বলে চেঁচিয়ে উঠলো, বলো হরি—

আমরা তিনজনে বলে উঠলুম—হরি বোল্—

এই রকম চেঁচাতে-চেঁচাতে আমরা গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়লুম। বড় রাস্তাটা দিনের বেলায় লোকের আর ট্রাম-বাসের ভিড়ে চলা যায় না। কিন্তু তখন রাত প্রায় তিনটে, তাই একেবারে ফাঁকা। আমাদের চলতে কোনও কষ্ট হল না। শুধু বড্ড শীত করতে লাগলো। কিন্তু শ্মশান বেশী দূর নয়। একবার সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারলে চিতার আগুনে গা গরম হয়ে যাবে, ওই আশায় আমরা করুণাদাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম।

হাজরা রোডের মোড়ে আসতেই ভূতো বললে—তোরা করুণাদা'কে এই-টুকু রাস্তা তিনজনে বয়ে নিয়ে চল, আমি ততক্ষণে দৌড়ে শ্মশানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখি গে—

আমরা রাজী হয়ে গেলাম। মড়া পোড়ানোতে আমরা সেই বয়সেই ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিলাম। কাঠ কিনতে, পুরুত মশাইকে ডেকে আনতে অনেক সময় নষ্ট হয়। আর চেয়ে আগে সেখানে গিয়ে একজন সব ব্যবস্থা করে রাখলে অনেক সময় বাঁচে।

আমরা বললাম—তাই যা, তুই দৌড়ো—

শতদল সামনের দিকে ছিল। সে একলা খাটিয়ার মাঝখানে কাঁধ দিয়ে কোনও রকমে লাশটা বয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। তার গায়ের জোর আমাদের চেয়ে বেশী ছিল।

যখন আমরা শ্মশানে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন ভেবেছিলাম পুরুত ডেকে কাঠ-টাট কিনে ভূতো আমাদের জন্যে সেখানে তৈরী হয়ে আছে। আমরা শুধু গিয়ে লাশ পোড়ানো শুরু করে দেবো।

কিন্তু কোথায় কী? ভূতোর দেখা নেই। ভাবলাম, ভূতো বোধ-হয় শীতের চোটে বাইরে গরম চা খেতে গেছে। কিন্তু না, আমরা বাইরে গিয়ে অনক খোঁজাখুঁজি করলাম, অনেক ডাকাডাকি করলাম। কোথাও ভূতোর দেখা নেই। অনেকক্ষন তিনজনে তার জন্যে অপেক্ষা করেও ভূতোর দেখা পেলাম না।

আমরা জানতাম ভূতো খুব কাজের ছেলে। বিশেষ মড়াপোড়াবার ব্যাপারে যতবার ভূতোর সঙ্গে মড়া-পোড়াতে শ্মশানে এসেছি, ততবার যা কিছু করবার সে-ই সব কিছু করেছে। কাঠ কেনা থেকে আরম্ভ করে মুখে আগুন দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু।

ভাবলাম, নিশ্চয়ই সে এখুনি এসে পড়বে। নিশ্চয় সে কোনও একটা ব্যাপারে কোথাও আটকে পড়েছে।

শতদল বললে—আর একটু অপেক্ষা করা যাক, সে এলে তাকে কাঠ কিনতে পাঠাবো—ও সব কাজ তো বরাবর ভূতোই আগে করেছে। সে সব জানে!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তখন ভূতো এলো না তখন বঙ্কু বললে—বোধহয় এখানেই কোথাও সে ঘুমিয়ে পড়েছে, যা শীত—এই বলে বঙ্কু চীৎকার করে ডাকতে লাগলো—ভূতো, ভূতো আছিস?

কেউ সে-ডাকে সাড়া দিলে না। শ্মশানের ভেতরে তখন আরো দু'তিনটে চিতা জ্বলছিল! আমরা সেই চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গা-হাত-পা গরম করতে-করতে ভূতোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাদের খুব রাগ হতে লাগলো ভূতোর ওপর। সে-ই আমাদের বাড়ি থেকে ডেকে আনলে আর সে নিজেই কিনা ডুব মারলে। অথচ করুণাদা আমাদের কেউ নয়, বন্ধু তো নয়ই। বরং ভূতোরই বলতে গেলে এক মেসের সঙ্গী! ভূতো যদি আমাদের ডাকতে না আসতো, তো আমাদের দায় পড়েছিল করুণাদাকে এত কষ্ট করে এই শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে শ্মশানে নিয়ে আসতে!

কিন্তু ঘড়িতে যখন ভোর চারটে বাজলো, তখন আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না। তখন আমি কাঠ কিনতে গেলাম। আর শতদল গেল পুরুত মশাইকে ডাকতে।

যখন আমি কাঠ কিনে নিয়ে এসেছি, তখন পুরুত মশাইও এসে হাজির। শ্মশানের ডোমদেরও ডাকা হলো। তারা চিতা সাজাতে লাগলো। তারা শেষকালে করুণাদার মাথায় গঙ্গার জল ছিটোবার জন্যে মুখের ঢাকাটা খুলে ফেললে।

আমরা মড়ার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছি। এ কার মুখ? এ তো ভূতোর মুখ?

শতদল বললে—আরে, এই তো ভূতো! এ তো ভূতোর লাশ!

আমরা সবাই-ই অবাক্‌। আমরা কি তা'হলে এতক্ষণ ভূতোর মড়াকে কাঁধে করে বয়ে এনেছি? আমরা ভয়ে আরো কাঁপতে লাগলাম। আর দাঁড়ালাম না সেখানে। আদি গঙ্গার ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে এপারে উঠে যে যার বাড়ি চলে এলাম। ভূতোর মড়া পুড়লো কি পুড়লো না, তা দেখবার সাহস আমাদের রইল না।

এর পর থেকে কেউ ডাকতে এলেও আমরা আর কারো মড়া পোড়াই নি।

——